মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

আগস্ট, ২০২৫
শ্রাবণ, ১৪৩২

সূচীপত্র

২৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৪৩২/আগস্ট ২০২৫

ব্রহ্মানন্দে ব্রহ্মলীন		৩
দিব্যচেতন হোক ব্যাস্ত বিশ্বময় গড়তে নবীন বিশ্ব	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
শিল্পী	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	১৪
খুঁজে নাও জীবনের অভ্যন্তরে ভগবৎ ভাবচেতন্	তনিমা চ্যাটার্জী	১৫
হোক ভগবৎ বিশ্বাস পরম দৃঢ়	সায়ক ঘোষাল	১৭
দেবভূমি ভারতবর্ষ	রীতেন বসাক	১৮
স্বামী ভাস্করানন্দের সঙ্গে সিঙ্গাপুরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র	পার্থসারথি বসু	১৯
শ্রী অনির্বাণ প্রসঙ্গে	আশুরঞ্জন দেবনাথ	২১
মা	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	২৪
The Meditative Personality	Prof. (Dr.) R. P. Banerjee	24

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

ব্রহ্মানন্দে ব্রহ্মলীন

সভ্যতার ইতিহাসে সাধারণভাবে মানুষের জীবন ও বৃত্তিকে জড় অভিমুখি বলা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, এটি আপাত পরিচয়। প্রকৃত পরিচয়ে মানুষকে জড় অভিমুখি থেকে চৈতন্য অভিমুখি বলা যায়। সাধারণ বর্ণনায় মানুষের মধ্যে তিনটি প্রধান প্রবণতাকে দেখা যায়। এগুলি হল ঃ Acquisition – possession - perpetuation বা অধিকার করে নেওয়া — রক্ষ করা — আগামীর অভিমুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অধিকার অর্জন-রক্ষা অথবা একে স্থায়ী করবার কাজ— সবই জাগতিক সুখ নিয়ে আসে। মুখে হাঁসি, মনে আনন্দের ঢেউ নিয়ে আসে। একটা সাময়িক স্বস্তি-প্রশান্তি অথবা সুখের প্রলেপ এসে যায়। মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে বিজয়ীর বোধ। বিজয়ী যে হয় তার নিজের ক্ষমতা—যোগ্যতার উপর এসে যায় আরও বেশি মাত্রার আস্থা-বিশ্বাস। জগতের সাপেক্ষে এটি একটি খুব বড় অবস্থা, বিশেষ হয়ে ওঠার এই ক্ষণটি। বিশেষ মাত্রার এই অবস্থার মধ্যে যে সুখ অথবা জাগতিক আনন্দ আসে তার মেয়াদ অল্প দিনের। ঘটনার স্রোত একটু ঘুরে গেলেই হয়ে যায় তার মাঝে পরিবর্তন। পরিবর্তন শুধু যে ঘটনার পর্যায়ক্রমে হয় তাও হয়। পরিবর্তন ঘটে যায় সময়ের পটভূমিতে সময়ের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হয়ে চলে জীবন প্রবাহ। আজকের রাজা আগামীতেও রাজার প্রসার নিয়ে জগতে থাকবেন সেটি বলা যায় না। রাজার রাজবৃত্তের বাইরেই রয়েছে বিপরীত অবস্থা। ঋষিগণ তাই আনন্দ খুঁজতে বলেছেন। আনন্দ ঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজনাৎ আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি।
সঃ এষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা
সঃ য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। (তৈ. উ. ৩/৬/১)

আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ থেকেই সব জীবনের আগমন। আনন্দের আহরণের মধ্য দিয়েই জীবগণ বাড়তে থাকে। জীবন পাওয়া থেকে জীবন সঞ্চালন সবই আনন্দেদ্দর পটভূমিতে হয়ে চলেছে। আবার শেষ, প্রয়াস পর্যন্ত আনন্দের মধ্য দিয়ে অবগাহন করে জীবন এগিয় চলে - পরিনাম আনন্দের মধ্যেই ডুবে যায়। ভৃগু ঋষি বরুণ দেবতার কাছ থেকে এই আনন্দ তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ আনন্দের মধ্যেই হৃদয়পূর্ণ ভালবাসায় ডুবে যান।

জগতের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আনন্দ বিচার চলে। ঋষিগণ বেদ সভ্যতার একবারেই আদি সময় থেকেই খুঁজেছেন আনন্দের স্থায়ী উৎস। ঋগ্বেদ, সামবেদ আনন্দের পর্বকে বর্ণনা করে স্বতঃই ব্রহ্মপথের ব্রহ্ম সাধনের মধ্যে আনন্দের উৎস দেখেছেন। যজুর্বেদের কৃষ্ণ শাখায় ব্রহ্মানন্দের তত্ত্ব এসেছে। যজুর্বেদের ঋষি বৈশম্পায়ন মহাভারতেরও প্রধান ঋষি। আত্মার তত্ত্ব তিনি বিশদে এনেছেন। একটি মত অনেক বিশিষ্টজন ব্যক্ত করেছেন যে কৃষ্ণ যজুর্বেদ কর্মপ্রধান আর শুক্ল যজুঃ জ্ঞান প্রধান। দু'টি ধারণাই যজুর্বেদের পরিবেশিত উপনিষদের নিরিখে বিচার করলে ভ্রান্ত বলে জানা যাবে। কৃষ্ণ যজুঃ আর শুক্ল যজুঃ দু'টির মূল রয়েছে ব্রহ্ম পরিচয় খুঁজে নেওয়া আর সমর্পণ করবার মধ্যে। এজন্যই যজুর্বেদের ব্রহ্মতত্ত্ব হল 'অহং ব্রহ্ম অস্মি'—ব্রহ্ম স্বয়ংই এই মানব পরিচয়ের মধ্যের আদি সনাতনী প্রকৃত পরিচয়। উভয়েরই সাযুজ্য এবং একত্ব প্রধান। সাধন রীতিও এক বৈশম্পায়ন বুঝলেন শিষ্য যাজ্ঞবল্কের প্রতিভার স্ফুরণ করতে হলে তাকে স্বাতন্ত্রে বাড়তে দিতে হবে। একই ব্রহ্ম তত্ত্ব দু'জনে প্রকাশ করলেন। কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আত্মা-পরমাত্মার একত্ব ও সাধন পথে সচ্চিদানন্দ সনাতনকে প্রজ্ঞারূপে বাস্তবে মানবের অস্তিত্বকে জীবন রথ ধরে নিয়ে এই বাস্তব মানব জীবনের মধ্যেই পরমাত্মার বোধকে জাগ্রত করলে হবে ব্রহ্মানন্দের স্ফূরণ। ঋষি ভৃগু বললেন— বিষয়ের মধ্যে নিজ স্বার্থের পুরণে যে সুখ বা আনন্দ হয় সেটি বিষয়ানন্দ। এই একই যদি একটু বড় পটভূমিতে হয় যেমন জগতের Welfare, বহুর হিতসাধন বা সি-এস-আর যে তৃপ্তি দেয় সেটি জগদানন্দ। এসব পেরিয়ে যখন ব্রহ্ম সনাতনকে এক ও অভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয় সাধকের সমাধিতে একাত্মতায় সেটি হয় ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দেই মহাশিব সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পূর্ণত্বের হয় প্রকাশ। যাজ্ঞবল্ক এখানে ব্যাখ্যা করলেন। এই জগৎ, সবকিছু সম্পদ সবই ভগবানের দান জীবনকে। যাজ্ঞবল্ক এই তত্ত্ব বিচার করে চাইলেন একটি সমাজ গড়তে, যেটি তাঁর গুরু বৈশম্পায়ন শ্বেতাশ্বতরে ব্যক্ত করেছেন এই জীবন মাঝেই দিব্যের প্রতিষ্ঠা - দিব্যজীবন যার ভিত্তি গুরু বৈশম্পায়নের তত্ত্ব 'যোগাগ্নিময়ম শরীরম্। এর সামাজিক বিকাশ পরম্পরার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাজ্ঞবল্ক প্রকাশ করলেন তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপনিষদের মধ্য দিয়ে কেমন করে হবে উন্নত ও দৈবী প্রকৃতির প্রজন্ম। বর্ণনার এই অংশটি এতটাই বিস্তৃত ও সরাসরি ব্যক্ত যে যেকোন পর্ণ গ্রন্থও তার কাছে হার মানবে। ঋষির উদ্দেশ্য বিষয়ানন্দ—জগদানন্দের দড়ি ছিঁড়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে ব্রহ্মানন্দের অমৃত সাগর অবগাহনে, জীবনে দিব্য বরণ ও প্রকাশ করতে। যজুর্বেদের কৃষ্ণ শাখা শিখিয়েছে ব্রহ্মার্পণ ব্রহ্মে সমর্পণ — কন্‌সিক্রেশন টু গড। তখনই হবে পূর্ণত্বের বোধ। ব্রহ্মানন্দের বিকাশ হয় বিশুদ্ধ মন-প্রাণ-হৃদয়ের ভগবানকে নিবিড় ভালবাসায় বরণ করবার মধ্য দিয়ে, নিজেকে ভগবৎ চরণে পূর্ণ নিবেদনেই আসবে ব্রহ্মানন্দ।

—ঃঃ—

দিব্যচেতন হোক ব্যাস্ত বিশ্বময় গড়তে নবীন বিশ্ব

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বব্যাপ্ত বিশ্বচেতন ঃ মানুষেরেই জন্য হয়েছে পৃথিবী, মহাবিশ্ব, একের পর অন্য বিজয়ও অধিকার অর্জন করে মানুষ হয়েছে সবার মধ্যে সেরা। অন্যসব প্রাণ মানুষের অধীনতায় বিরাজ করছে। ভূমি অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম — এই পঞ্চ মহাভূত মানুষ তার পছন্দের রঙে ও ঢঙে গড়ে নিচ্ছে। ধরিত্রীর উপর অধিকার প্রয়োগ করে কিছুটা মাত্রায় অনুর্বরকে আরও উর্বর, আরও উৎপাদনী করে গড়ে তুলতে নানা ধরনের চাষরীতির অঙ্গ হিসেবে রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগে, হরমোন জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করে উপযুক্ত করে তুলতে গিয়ে ভূমির চরিত্র বদল ঘটিয়ে দিচ্ছে। মানুষের অধীকারজনিত হস্তক্ষেপ হয়ে চলেছে ভূমি-জল-বায়ু-অন্তরীক্ষ - আকাশ সবেরেই উপর। মানুষই নিজেকে রাজা জ্ঞান করে চলেছে সর্বত্র, সব ক্ষেত্রে। জীবন সৃষ্টি, জীবনের এগিয়ে চলা, সমগ্র বিশ্বের চলমান আর গতিময় হয়ে এগিয়ে চলবার জন্যই মহাকাল, দেবাদিদেব, কালপ্রবাহ সৃষ্টি করেছেন জীবনের সৃষ্টি আর পথচলার জন্য।

সঃ যঃ চ অয়ম পুরুষে। যঃ চ অসৌ আদিত্যেঃ। সঃ একঃ।
সঃ যঃ এবং বিৎ। রসঃ অস্মাৎ লোনাৎ প্রেত্য।
এবম অন্নরসয়ম আত্মানম উপ সংক্রামন্তি।
এতম প্রাণপ্রেয়ম আত্মানম উপসংক্রামন্তি।
এতম মনোময়ম আত্মানম উপসংক্রামন্তি।
এতম বিজ্ঞানময়ম আত্মানম উপসংক্রামন্তি।
এতম আনন্দময়ম আত্মানম উপসক্রামন্তি।
তৎ অপি এষ শ্লোক। ভবতি।। (তৈ.উ. ২/৮/৬)

সমাধির আলোয় সাধকের চেতনায় ব্রহ্মপ্রজ্ঞা ফুটে ওঠে। ক্রমে এই প্রজ্ঞার সঞ্চার হ'তে থাকে এক অনির্বচনীয় অজানা অচেনা আলোর সাগর হয়ে। ঐ আলোর সাগরের মাঝে ফুটে ওঠে কালের পথচলার ঢেউ। কালের পথে এগিয়ে গিয়ে সমগ্র সৃষ্টি হয়ে ওঠে এক অনবদ্য অচল গতিষ্মান জীবন পর্ব জগতের কোণে কোণে সর্বত্র। দেবতার প্রকাশ রূপের প্রবাহ জানিয়ে দেন সূর্যদেব তাঁর প্রকাশের দীপ্তি আর মাধুর্য দিয়ে। যে প্রকাশ দীপ্তি হয়ে ওঠে সর্বত্র ব্যাপ্ত। আলোর উৎস হয়ে তিনি প্রতিটি সময়ের কণায় সৃষ্টি করে চলেছেন আলোর মালা। কখনও সহজ সুন্দর পথের সরাসরি আগমনে। আবার কখনও বা কোনও বিশেষ ব্যাপ্তির মধ্যে প্রবেশ না করেই সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে জগতকে ঐ দিব্য আলোকের মালায় জীবনে ধারণ বরণ আর গ্রহণের প্রেরণা ঢেলে দিয়েছেন। আলোর সঞ্চারে ভগবান স্বয়ং আলোক দীপ্ত হয়ে জগৎ মাঝে ব্রহ্ম সনাতনের আকর্ষণ দীপ্তি আর তার উপরই দিয়েছেন শক্তির বীজ। আলোক মালা রূপে তিনি ভূমি-জল-বায়ু-অন্তরীক্ষ-আকাশ সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দিয়ে চলেছেন তাঁর ব্রহ্ম তেজ। ব্রহ্মতেজই এই জীবন মাঝে ফুটে উঠেছে জীবনের চালিকা শক্তি। যে জীবন এপর্যন্ত এক অনাবিল পরোক্ষ আস্বাদ পেয়েছে ভগবানের কৃপার স্পর্শ অনুভব করে। তারই এখন হয়ে চলবে উন্মোচন এই একান্ত পথচলার পর্বে পূর্ণ সত্যের উন্মোচনের জন্য আগ্রহ ও আকূতি।

মহাবিশ্বের এই মহাসৃষ্টিকে ধারণ করে রয়েছেন পরম পুরুষ তিনি। ভগবান স্বয়ং ব্যাপ্ত হয়ে বিরাজমান সব বস্তু প্রাণাদির অন্তর জগৎ মাঝে। কখনও তিনি প্রকাশমাত্রায় এখনই এসেছেন এগিয়ে যে সাধারণভাবে ধ্যানী মনই তাঁর প্রভাব বলয় পেয়ে যায় জীবনের পথচলার মধ্য দিয়ে। সূর্যদেব স্বয়ং জীবনের এই পথচলার প্রাণশক্তিকে উদ্বোধন করে জাগ্রত করে দিয়েছেন জীবনের পর্বে পর্বে। সব জীবনের কাছে এনেছেন জাগরণের বার্তা। সূর্য্যদেব ঐ জাগরণের বার্তা দিয়ে আহ্বান করেছেন জীবন মাঝে সবারই উন্মেষ ঘটাতে। তিনি জীবনের পর্বগুলির মধ্যে দিয়ে ঐটিকে ফুটিয়ে তুলছেন। সময়ের এগিয়ে চলার সঙ্গে হাত ধরেছেন সূর্যদেব তার আলোক আর শক্তির বিতরণের মধ্য দিয়ে বরণ করে নিতে। যে জেনেছে এই তিনিই অখণ্ড আলোক মালা দিয়ে ক্রমাগত উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে জীবনের কাছে। এখন উন্মোচন হবে এই জীবন যেন সব কিছুকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এখন এই আলোর প্রবাহ কখনও অনন্ত আলোক দীপ্তির উপলব্ধির ঝলক-এর প্রকাশের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলছেন। জীবনের পথচলা শুধু নয়; মৌলিক অবদান। যে শক্তির প্রকাশ অনুমাত্রায় করেছে সব জীবনকে ধারণ। মানুষগণ ক্রমে

জীবনপথের প্রবাহে সৃষ্টির এই পর্বের সব উপাদানই ভগবৎ নির্ভর। আলোর সহযোগে যে প্রশ্ন উঠেছে জগৎ মধ্যে জগৎ ব্যাপ্ত মহাসূর্যের উপর নির্ভর করেই অসম্ভব সব বোধ হতে হয়। ভাগবতী প্রসাদ হয়ে জীনমাঝে ক্রম ব্যাপ্তি ঐ বিরাটের সঙ্গে যুক্ত করে।

চিরন্তনী দৈবী আকর্ষণে ঃ

অশ্রাব্য অস্ত শ্রৌষদ্ যজ যে যজামহে।
বাষট্কার অতদ্বৈ যজ্ঞস্য প্রয়ানাম্ এষ।
প্রতিষ্ঠা এতদ্ উদয়নাম যঃ এবম বেদম্।
প্রতিষ্ঠিতেন অরিষ্টেন্ যজ্ঞেন সংস্থাম গচ্ছতি।। (তৈ. স. ১/৬/১১/৪)

শুরুতে ছিল ঐ সাধন পথের আহ্বান হয়েছিল সঞ্চয় অভীপ্সার।
হয়েছে বিকাশ মাধুর্যের দিব্য প্রভা করতে জাগ্রত জীবন চেতনে।
সাধন যাত্রার এই শুভক্ষণে এসেছে যা কিছু হয়ে প্রতিষ্ঠার আহ্বায়ক
এখন ঐ সাধন পথের সব সম্পদ হয়ে স্ফুরিত হবে জীবন বিকাশ পাথেয়।
যেমনে হয়েছে পাথেয় তোমারই বাকের নিত্য প্রকাশ মাধুর্যের পথে।
পূজার ক্ষণ এখন ঐ চিরন্তনী দৈবীভাবের আকর্ষণে হয়ে পরিপূর্ণ দেবতার ছন্দে।
নটরাজের ছন্দ করে অঙ্গমাঝে বরণ মহাকালীর যে জগৎপ্রকাশ মূর্চ্চনা
তেমন করেই নিত্য পথের একান্ত নিবেদনের ক্রম সাযুজ্য পর্বের সাধনে।।

পঞ্চমাত্রার সাধনপর্বে ঃ

পঞ্চানাং ত্বা বাতানাং যন্ত্রায় ধর্ত্রায় গৃহ্ণামি।
পঞ্চানাং ত্বা ঋতুনাং যন্ত্রায় ধর্ত্রায় গৃহ্ণামি।
পঞ্চানাং ত্বা দিশাং যন্ত্রায় ধর্ত্রায় গৃহ্ণামি। পঞ্চানাং ত্বা পঞ্চজনানা।
যন্ত্রায় ধর্ত্রায় গৃহ্ণামি। চরৌ ত্বা পঞ্চবিলস্য যন্ত্রায় ধর্ত্রায় গৃহ্ণামি। (তৈ. স. ১/৬/১/৭)

পঞ্চশক্তির বিকাশপর্ব এখন এই সাধন পর্বে।
পঞ্চ রাত নিয়েছে এক অনন্য বিকাশ ধারা মহাপ্রাণের অন্তরে।
প্রাণ-অপান-ব্যান-সমান-উড়ান দিয়েছে জীবনের গতি।
সব ঋতুপর্বের মধ্যে পঞ্চমাত্রায় সব ঋতুর মাঝে হয়েছে।
উন্মেষ মহাপ্রাণের এই জীবন্ত শক্তির আকর্ষণে হয়ে ভরপুর।
এখন এসেছে আহ্বান পঞ্চমাত্রার শক্তির উদ্বোধনে, সাধনে।
এসেছে ধরিত্রীর আহ্বানে মধ্যজগতে স্বর্গে পাতালে আর অন্দরে।
সৎ চিৎ আনন্দের উৎস সন্ধানে নবীন জীবন যাত্রায়।।

জাগরণের মন্ত্র
হোক ধ্বনিত ঃ

ব্রহ্মনাঃ ত্বা তেজসে যন্ত্রায় ধর্ত্রায় গৃহ্ণামি।
ক্ষত্রস্য ত্বা ওজসে যন্ত্রায় ধত্রায় গৃহ্ণামি।
বিশে ত্বা যন্ত্রায় ধত্রায় গৃহ্ণামি।। (তৈ.স. ১/৬/১/৮-১০)

মন্ত্রের সাধন করেছি এখন মন্ত্রের ভাবনায়।
তোমার পথের অভিযান এখন তোমারই দিকে
যে শক্তির প্রভাব এসেছে প্রাণপ্রবাহে এখন তারই।
উন্মেষ পর্ব জীবনের চরম স্ফূর্তির এই ক্ষণে।
তোমারই পথ অভিযানে চলেছি একান্তে অন্তর মাঝে।
সাধন রীতির এই পর্বে হয়েছে যুদ্ধের প্রস্তুতি।
তোমার পথ অভিযানে এসেছে সংঘাত।
জীবনের জাগরণের পথ ধরে চল এগিয়ে দিব্য পথে।।

বিপুল এই বিশ্বশক্তি ঃ

সুবীর্যায় ত্বা গৃহ্ণামি সুপ্রজাঃ ত্বা গৃহ্ণামি।
রায়স্পোষায় ত্বা গৃহ্ণামি ব্রহ্ম-বর্চসায় ত্বা গৃহ্ণামি।

ভূঃ অস্মাকং হবিঃ দেবানাম, অশিষো যজমানস্য।
দেবানাং ত্বা দেবতাভ্যো গৃহ্নামি। কামায় ত্বা গৃহ্নামি।। (তৈ.স. ১/৬/১/১১-১৬)
দিয়েছ তুম বিপুল এই শক্তির সম্ভার জীবনপথে।
করেছি অবলম্বন তোমারই চেতন বিপুল এই সাধন যজ্ঞে।
হয়ে মগ্ন জীবনের সব সম্পদের গভীর অন্তঃপুরে।
নবীন পরম্পরায় তোমারই সাধন পর্বে হয়েছে উত্থান চেতনার।
বিস্তৃত এই পটভূমি দিয়েছ তুমি সাধক জনের সাধন প্রজ্ঞায়।
ধরিত্রী চেতনের এখন এসেছে ক্ষণ সব প্রকাশ পর্বের সংস্থানে।
সাধন আকাঙ্খার এই ক্ষণে করেছি বরণ একান্তভাবে তোমায়।।

কণাব্রহ্ম ঃ বহু বৈচিত্রের মধ্যে সন্তরণ করেও জীবনের মাঝে ফুটে ওঠে এক নিশ্চিৎ চেতন ক্ষেত্রে পৌঁছে যাওয়ার প্রয়াস। চিন্তা-কর্ম-ধ্যানের বৈচিত্র এখন জীবন মাঝে বহু বিস্তৃতির মাঝে একের ফুটে ওঠবার ক্ষণ। যে চেতনার ঢেউ সমাজ সভ্যতাকে প্রভাবিত করে পাল্টে দেয় তারই আবার স্থিত হয়ে বিরাজমান হবার এই একক প্রয়াস বহুর বাতাবরণে যুক্ত হয়ে করে দেয় নবীন ভাবনার গতিসঞ্চার। বিশ্ব মাঝে বিশ্বশক্তির এখন জাগরণ হয়ে উঠবে অনিবার্য রূপবান গতিষ্মান প্রকাশ।

এক তিনি, জীবনের বহু বৈচিত্রের মাঝে ফুটে উঠেছেন বহু হয়ে। একত্বও বহুত্বর মধ্যে অনেকে আবিষ্কার করেছেন সংঘাতের সম্পর্ক। একত্ব ও বহুত্ব একই সত্যের দু'রকম প্রকাশ। এক তিনি সর্বদাই একত্বে বিধৃত। একত্বের দৃষ্টিতে তিনি সর্বদাই লক্ষ্য করেছেন সবকিছুর মধ্যে অন্তর্নিহিত সাযুজ্য। অন্তর্নিহিত সাযুজ্যকে অনুমানে বোঝা যায় ও ধারণ করা যায় যখনই হয়ে ওঠে এক ও বহুর মধ্যের উৎপত্তি — বিকাশ-প্রচলনও পরিণতি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। বিশেষ এই দৃষ্টিভঙ্গি হল আত্যন্তিকে সাযুজ্যকে অনুভবে জানা ও একান্তে বরণ করে নেওয়া।

তৎ নমঃ ইতি উপাসীত। নম্যন্তেঃ অস্মৈ কামাঃ।
তৎ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি।
তৎ ব্রহ্ম। পরিমরঃ ইতি উপাসীত।
এনম্ দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ পরি যে অপৃয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ।
সঃ যঃ চ অয়ম পুরুষে যঃ চ অসৌ আদিত্যে সঃ একঃ।। (তৈ.স. ৩/১/৪)

বহু ও একের মধ্যেকার ঐক্য ও সাযুজ্যই এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যেকার আত্যন্তিক সাম্য। এই সাম্যবোধই জীবনের জন্য পরম আদরণীয় এবং শ্রেষ্ঠ একটি জীবন লক্ষ্য। সাম্যবোধ আর সাম্য বিষয়ের আবেদন জীবনের এক অনন্য দর্শন এবং বাস্তব পথ। ঋষিগণ মৌল সত্যের উপাসক ছিলেন। জগৎ ও জীবনের মৌল সত্য হল সবই ভগবান থেকেই জাত, গ্রথীত ও পরিবেশিত। জগৎ ও জীবনের মধ্যে মৌল সূত্রটি হল— আদি সৃষ্টির মূলে একত্ব। এই মূলে একত্বই প্রথম সত্য। প্রথম সত্যকে নির্ভর করেই জীবনের পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। ব্রহ্ম সনাতনকেই প্রণাম করতে হয়। তাঁকে প্রণাম নিবেদন করেই জীবনের সব বাসনাকে বরণ করে নিয়েই এগিয়ে যেতে হয় জীবনের পথ দিয়ে। ভগবানকে অনন্ত অসীম পরিচয়ের মধ্য দিয়েই খুঁজে নিতে হয় তারই রূপ প্রকাশ ও জগৎ প্রকাশের মধ্য দিয়েই। তাঁকেই প্রণাম নিবেদন করেই হয়ে ওঠে জীবনের সচল প্রকাশমার্গ হয়ে ওঠে জীবনের সব নিবেদন আর আবেদনের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠবে ব্রহ্ম ভাব মার্গের জগৎ বিচার ও জগৎ বিষয়ে ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠা। একান্ত বিকাশ হতে হয় প্রয়োজন জীবনের আত্যন্তিক পরিচয়কে ফুটিয়ে তোলা। যে পরিচয়টি সবারই জন্য এক তারই নিত্য দিনের বিকাশের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলার আনন্দপূর্ণ এক বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমি। সব প্রাণের মধ্যেই ব্রহ্ম কণারূপে তিনি জীবনের মধ্যে নিজেই হয়েছেন স্থিত একান্ত আপনত্বের বোধে। ব্রহ্ম সনাতন স্বতঃই হয়েছেন জীবনের সঙ্গে সদা অন্বয়ে বৃত। তিনিই স্বতঃ এখানে বিরাজমান।

ভূমির কণায় কণায় রয়েছে সৃষ্টির ক্রমাগত এগিয়ে চলবার উপাদান। ধরিত্রী মাতার অনন্ত বিস্তৃত এই ভূমি পরিচয়ের মধ্যে রয়েছে একান্ত একমুখি অনুভবের দ্যোতনা। ভূমির প্রতিটি কণা মাতৃসমা। তিনি জীবনের মাঝে হয়েছেন স্বতঃই মূর্ত। তিনি একান্ত বিকাশের মধ্য দিয়েই চলেছেন এগিয়ে একান্তভাবে। ভূমির প্রতিটি কণাই তাঁর এই মাতৃস্বরূপা ভূমিরূপের বৈচিত্র ধারণ করে এগিয়ে যাবে নতুনের অভিযানে। এই ভূমি মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করবে সাধন প্রাণ। অন্তর বাইরের এই আকাশরূপ জীবনের এই এগিয়ে চলবার পথে কখনও একান্ত জীবন উপাদান কখনও বা মহাশূন্যের সঙ্গে মিশে যাওয়ার জগতের আকাশটি

অন্তর মাঝে হয়ে ওঠে আকাশরূপী ব্রহ্ম প্রকাশ হয়ে। তারই এটি দ্বৈত প্রকাশ। এটির প্রকাশ সংস্থান করে চলেছে অনন্ত ভাব পথের এক সীমাবদ্ধ সীমিত প্রকাশের মধ্য দিয়ে স্থিত আর গতিময় প্রকাশ মাধুর্যে। এই গতিময় প্রকাশের জাগতিক ব্যাপ্তি স্বতঃই হয়ে উঠবে জীবনের এই বহু বৈচিত্র্যের দীপ্তিমুখর এই প্রবাহে হয়ে ওঠে জীবন মাঝে জড় সত্যের পরম প্রকাশকেই গুণান্বিত করে আগামীর পথে এগিয়ে যাওয়া। ঐ ব্রহ্মপুরুষ স্বয়ং এই মহাবিশ্বের কণায় কণায় হয়ে রয়েছেন সুপ্ত চৈতন্যের রূপে। এই সুপ্ত চৈতন্যই ক্রমে ফুটিয়ে তুলবে অনন্ত প্রকাশের জগৎ পরিবেশনে। তিনিই হয়েছেন মাতৃরূপা এই ধরিত্রী আর তারই প্রতিটি ভূমিকণা। ব্রহ্ম সনাতন হয়েছেন এই আকাশ-এই বাতাস-এই জলরাশি-ভূমি-অন্তরীক্ষ-মহাকাশ। সবই এই জীবনের মহাপ্রকাশ। জগৎ আর জীবনের সব অঙ্গই ভগবানের দেওয়া। এই জীবন স্রোতকে করতে চেয়েছেন উদার উন্মুক্ত এক মহৎ পরিণামী ভাগবতী বিকাশ। দৃশ্যে-অদৃশ্যে যা কিছু সচল অথবা স্থিত জীবনসমূহ সবই ভগবানেরই একান্ত নিবেদন।

তুমিই নিত্য-শাশ্বত-অসীম-ধ্রুব ঃ

ধ্রুবঃ অসি ধ্রুবঃ অহম্। সজাতেষু ভূয়াসং ধীরঃ।
চেতা বহ্বিচিৎ। উগ্র, অসি উগ্র অহম্ সজাতেষু।
ভূয়াসং অভিভূঃ চেত্ত্বা বসুবিৎ যুনাস্মি ত্বা ব্রহ্মনা।
দেব্যেন হব্যায়া অস্মৈ বোদরে জাতবেদঃ।। (তৈ.স. ১/৬/২/১-৪)

দেবতার আহ্বান আর কৃপার ধারা এসেছে সাধনে।
তোমায় করতে অনুভব অনন্ত চেতন মাঝে হয়েছি সন্ধানী।
যে দৃঢ় প্রত্যয়ের এই নিত্য ভাব ধারা ব্যাপ্ত হয়েছে
এখন নিত্য নবীন ভাবপ্রকাশের দৃপ্ত ব্যাপৃত জীবনের ব্রতে।
সাধনের আলোর এই ক্ষণপ্রভায় হবে নিত্য পথের অন্তর উন্মোচন।
ভগবানের বিপুল কৃপার ছন্দে হয়েছে এখন শক্তির উন্মেষ এখন।
ধরিত্রীর এখন চেতন বিকাশ ক্ষণ হয়েছে মূর্ত মুক্তির প্রতিক্ষায়।
এমন ক্ষণে বিকাশের পর্বে পর্বে বিশ্বচৈতন্যের অনুধাবনে।।

জীবন যজ্ঞ হয়েছে পূর্ণ তোমারই আলোকে ঃ

ইন্ধানাঃ ত্বা সুপ্রজসঃ সুবীরা জ্যোক জীবেম্।
বলিহৃত বয়ং তে। যৎ মে অগ্নে অসৎ যজ্ঞস্য রিষ্যাৎ।
যৎ বা স্কন্দৎ অজাস্য উত বিষ্ণো। তেঃ অস্মি সপত্নং।
দুর্মরায়ুম্ এনম দধামি নিঋত্যা উপস্থে।। (তৈ.স. ১/৬/২/৫-৬)

আলোর আহ্বান এসেছে জীবনে এখন দিব্য অগ্নির তাপন।
নবীন সাধন যজ্ঞ এখন জীবনময় হচ্ছে দীর্ঘপথ প্রসারিত।
আলোর অঙ্গীকার যদি পেয়েছো চল এগিয়ে সম্মুখে পরম্পরার প্রবাহে।
যেমন করে শুভ আসে সত্যের জীবন ধারায় হয়েছো যদি আপ্লুত
দেবতার প্রেরণা হয়ে যুক্ত করে দূরীভূত সব আবিলতার বাধার উন্মোচনে
বাঁধভাঙা ঢেউয়ের, এখন জগৎ বিস্তার জীবনের সব প্রবাহকে করে সংহত।
যে আলোক হয়েছে জীবনের এসব বিকাশ আহ্বায়ক জীবন পথে।
হোক এই নবীন প্রকাশী আলোর এগিয়ে চলার বিস্তার ক্ষণে।

আবিশ্ব হোক ব্যাপ্ত দিব্যচেতন শক্তিতে ঃ

ভূঃ ভুবঃ সুবঃ উৎ সুষ্মো অগ্নে যজমানায় এধি নি শুষ্মে।
অভিদাসসে। অগ্নে দেবা ইদ্ধ মনুঃ ইদ্ধ মন্ত্রঃ নিত্য মন্ত্র জিহ্বা।
অমর্তস্য তে হোতা মূর্ধনঃ আজিঘার্মি
রায়স্পোষায় সুপ্রজাঃ ত্বাম্ সুবীর্যায়।। (তৈ. স. ১/৬/২/৭)

ধরিত্রীর চেতন বিকাশ এখন মধ্যম বিশ্ব থেকে দেবস্থানে
কালের স্পন্দনে উঠুক জেগে নতুন চেতন ধারা যেমনে।
হয়েছে জীবনের সম্পদ বিকাশ চেতন রূপান্তরে।
দেবতার বিকাশ হয়েছে এই রূপান্তর পরের নিত্য জাগরণে

তোমারই বিকাশ পর্বের উন্মোচন এখন হোক একান্তে।
ভগবৎ ভাবনায় বিকশিত দিব্য চেতন শীর্ষে হয়েছে উন্মুক্ত করুণায়।
এখন উন্মুক্ত বিকিরণের প্রভা এসেছে জীবনের পূর্ণতার তরে।।

দিয়েছ উদার এই দিব্যমন সদাকৃপায় ঃ

মনঃ অসি প্রজাপত্যম্ মনসা মা ভূতেন অবিশা।
বাগসী ঐন্দ্রী সপত্ন ক্ষয়নী বাচা ম ইন্দ্রিয়ানা আবিশা।
বসন্তম্ ঋতুনাং প্রীনামি স মা প্রীতঃ প্রীনতু।
গ্রীষ্মম্ ঋতুনাং প্রীনামি স মা প্রীতঃ প্রীনাতুঃ।। (তৈ. স. ১/৬/২/১২-১৫)
দিয়েছ এমন মন যার অন্ত হয় না চেতন সীমায়।
দিব্য মনের দিয়েছ অবয়ব এমনই যার রয়েছে দেববরণের স্বতঃ আগ্রহ।
যারই হয়েছে দৈবী বিবেক এসেছে জীবন মাঝে তার স্বতঃপ্রভা
দিয়েছ সেই বাক যার উৎস দিব্য আবহে দিব্য প্রেরণায়।
এসেছে জীবন মাঝে বাঁধভাঙা আকর্ষণের পরিবেশে চলতে এগিয়ে
নানা ঋতুর আবহে বসন্তে, গ্রীষ্মে তোমারই করুণার ধারা ঝরুক বিস্তারে।
এখন আসুক মর্তপথে জীবনমাঝে দিব্য আনন্দের ধারা।
তোমারই ভাবদীপ্তিতে হোক পরিপূর্ণ জীবন তোমারই ভাবধারায় সদা।।

বিশ্বমানস ঃ মানুষের জীবন আর তার সব আত্যন্তিক ও আত্মিক সম্পদ ভগবানের দান। জীবনের গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও মন স্বতঃই যুক্ত হয়ে সব সম্পদ হয়ে উঠেছে মানুষের নিজেরই হাতে তৈরী ভিত্তিমূলে রয়েছে জীবনের ভাল হওয়া অথবা ভাললাগা গড়ে উঠবে একটির পর একটি পর্বে। যে বীজমূলে গ্রথিত ছিল সৃষ্টির মূলে, ক্রমাগতভাবে এই মূল শক্তির উর্দ্ধে বা নিম্নে বিরাজ করছে জীবনের মাঝে ঘটে যাওয়া নানা ঘাত-প্রতিঘাত, যে সম্ভাবনাকে আবেষ্টন করে এগিয়ে চলবেন। পথচলার মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে ভগবানের অভিমুখে। উন্মুক্ত এই উদার আকাশের বুকে হারিয়ে যাওয়ার পর্বটি বিরাট প্রভাব বলয় সৃষ্টি করেই হবে বিশ্বমাঝে। জীবনের যাত্রা নিজ নিজ অধ্যায় পেরিয়ে এগিয়ে জলবে– এপথ থেকে অন্য পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ খুঁজে নিয়েছে নিজের পরিচয়, হয়েছে দৃঢ়।

The mind that makes up narratives about the past is a sense-making organ. When an impredicted event occurs, we immediately adjust our view of the world to accommodatge the surprise. Imagine yourself before a football game between two teams that have the some record of wins and losses. Now the game is over, and the one team trashed the other. In your revised model of the world, the winning team is much stronger than the loser, and your view of the past as well as of the future has been altered by that new perception. Learning from surprises is a reasonable thing to do, but it can have some dangerous consequences.

A general limitation of human mind is its ability to reconstruct past state of knowledge, or beliefs that have changed. Once you adopt a new view of the world (or any part of it) you immediately lose much of your ability to recall what you used to believe before your mind changed.

Many psychologists have studied what happens when people change their minds. Choosing a topic on which minds are not completely made up-say death penalty – the experimenter carefully measures people's attitudes.

Damid Kahne man (winner of 2002 Nobel Prize in Behavioral Economics), Thinking Fast and slow: Penguin Books, An imprint of Penguin Random House, India, 2011, p. 202)

মনের বাতাবরণই পরিচয়কে গড়ে দেয়। চিত্ত-মানস-বুদ্ধি- প্রজ্ঞা-মনের এই চারটি বিভাগকে একত্রে গড়ে দিতে হয়। চিত্ত হল মানবের মনের মধ্যেকার প্রাচীন অথবা প্রাক্তনী হয়ে ওঠেছে জীবনকে ধারণ করবার জন্য। চিত্ত হল সেই ক্ষেত্র যেখানে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সব ঘটনার নিরেট পরিচয় ফুটে ওঠে। এই স্মৃতি ক্ষেত্রই মনের বর্তমান পর্বগুলি আবার আগামী দিনে গড়ে উঠবে স্মৃতির ভাণ্ডার। কিছ ক্ষেত্রে এই স্মৃতি জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য বুঝে নেওয়া। জীবনের পথচলায় ক্রমাগতভাবে বিশ্বাস, নির্ভরতার পথে জীবনের নবীন অবলম্বন গড়ে তোলার পিছনে কে পরিকল্পনার পথ

দিয়ে এগিয়ে চলবে। এই এগিয়ে চলবার পর্ব জীবনের অন্তর বস্তুর দৃঢ় অভিন্নতার পথ দিয়ে আরও এগিয়ে গিয়ে সংপৃক্ত করে তুলবে। নোবেল পুরস্কার (২০০২) সালে পেলেন। আর এরই মধ্য দিয়ে মনের শক্তি সংহত করে মানুষটি জীবন পথে করবেন। এর ফলে মনের মাঝে দৃপ্ত দৃঢ়তা গড়ে তুলতে হয়।

মনের ধারণ ক্ষমতা নিয়ে ডানিয়েল বিচার করেছেন। আর্থিক বাজার বা ক্যাপিটাল মার্কেটের মধ্যে যে সব কাজ চলছে আর কেনা-বেচার সঙ্গে সবসময়েই সরাসরি যোগসূত্র হয়েছে রচনা। শেয়ার বাজারের মধ্যে লাভ ক্ষতির পরিমাপ করা প্রদ্ধকৃতপক্ষে দুরুহ। অথচ যদি সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলি রয়েছে তারই হয়েছে সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত। ক্ষতির সম্ভাবনা মোটামুটিভাবে গড়ে উঠেছে দাম। বাজারের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কেনা-বেচার মধ্য দিয়েই রিস্ক মার্কেট গড়ে ওঠে। এই মনই একসময়ে বিশ্বাস-অভিপ্সায় পরিণত হতে পারে। ভগবৎ ভাব যখন মনের মাঝে জাগ্রত চেতনে মনকে প্রস্তুত করতে হয় দৃঢ়তায় বরণ করে নিতে পারে বিশ্বাসী উদ্যোগ। মনের দৃঢ়তার অভাবে তার কার্যকরী ক্ষমতা অনেক সময় উদ্যোগ নেওয়ার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আবার কখনও সেটি হয়ে ওঠে প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় শক্তিপূর্ণ। ভগবানের উপর বিশ্বাস যদি হয় দৃঢ় তবে সে মনটি এমনই সাধারণ অবস্থাতেই অনন্য ভাব নির্ভর ভগবত্তার শক্তিপ্রাপ্ত হয়।

কালাতীত বিশ্বাস প্রবাহ ঃ

বর্ষা ঋতুণাং প্রীণামি তা মা প্রীতাঃ প্রীনন্তু।
শারদম্ ঋতুনাং প্রীনামি সা মা প্রীতা প্রীনাতু।
হেমন্ত শিশিরৌ ঋতুনং প্রীনামি তৌ মা প্রীতি প্রীণাতু।
অগ্নিষোমাঃ অহং দেবয়জ্যায়া চতুষ্কান্ ভূয়ামাম।
অগ্নেঃ অহং দেবয়াজ্যায়া অনাদো ভূয়াসাম। (তৈ. স. ১/৬/২/১৬-২০)

বর্ষার ধারা এসেছে নেমে তোমার কৃপার আশ্রয়ে।
আনন্দের স্রোত হয়েছে সৃষ্টি তোমারই শক্তিতে জগৎ মাঝে।
শরতের প্রবাহ দিয়েছে প্রশান্তি সাধন পর্বের জাগরণে।
হেমন্তের শিশির ঝরা পরিবেশে হয়েছে বেগবতী প্রেরণার ধারা।
নতুন সৃষ্টির আগমনী নিয়েছে পরম বিকাশী আকর্ষণে।
হয়েছে দেবতার আগমনের প্রজ্ঞা পরিচয় এই সাধনে।
অগ্নির তাপনে হয়েছে নবীন দৃষ্টিস্নাত উপলব্ধিতে।
তোমায় করেছি নিবেদন ছিল যা কিছু দেবার সমগ্রে।।

অসীমের সন্ধানে ব্যাপৃত মনে ঃ

দব্ধিরসি অদব্ধো ভূয়াসাম অমুং দভ্যেয়ং।
অগ্নিষোমায় অহং দেবয়জ্যায়া বৃত্রহা ভূয়াসং।
ইন্দ্রাগ্নিয় অহং দেবয়জ্যায়া ইন্দ্রিযাব্য অল্লাদঃ ভূয়াসং।
ইন্দ্রস্য অহং দেবয়জ্যায়া ইন্দ্রিয়াবী ভূয়াসং।। (তৈ. স. ১/৬/২/২১-২৪)

দেবতায় দিয়েছি নিবেদন করতে আহরণ সর্বদাই।
রয়েছে যা কিছু সৎ বস্তু জীবনের অভিজ্ঞতার বশে।
নিত্য আহরণের তরে চলেছি এগিয়ে করতে গতির প্রবাহ মাঝে।
দিয়েছে জীবনের বরণীয় সব শক্তির উপহার জীবন প্রভায়।
সাধন পথের যা কিছু অন্তরায় সবই হয়েছে দূরীভূত জীবনে বরণে।
চলেছি এখন অসীমের সন্ধানে জগৎ চারণে দেবপ্রকাশ ক্ষণে।
যা কিছু রয়েছে জগৎ মাঝে মনবিক বিকার-পথ করতে আবিষ্কার।
দেবরাজের বিপুল এই প্রয়াস নিত্য জাগরণ তরে মূর্ত আকাঙ্খায়।।

ভগবৎ ভাবনা পরিগ্রহের ক্ষণ ঃ

মহেন্দ্রস্য অহং দেবয়জ্যায়া জেমানং মহিমানং।
গমেয়ম্ অগ্নেঃ স্বিষ্টিকৃতঃ অহং দেবয়জ্যায়া।
আয়ুষ্মান্ যজ্ঞেন প্রতিষ্ঠাং গমেয়ম্।। (তৈ. স. ১/৬/২/২৫-২৬)

নিবেদনের ক্ষণ এসেছে এখন অগ্নির সাধন প্রবাহে জীবন যজ্ঞে।

মহেন্দ্র রূপের প্রকাশ এসেছে সাধন প্রজ্ঞায় সঞ্চারণে।
দেবতার প্রতি নিবেদন এখন হয়েছে রূপময় গতিষ্মান
জীবনের এই দেওয়ার পর্ব হোক এখন প্রত্যয় দৃঢ় মূর্ত।
অগ্নি চয়নের এই ক্ষণে চেয়েছি স্বিষ্ট রূপের একান্ত উপহার।
জাগরণের প্রদীপ করেছি চয়ন জীবন মাঝে নবতর বিকাশ অভীপ্সায়।
উপলব্ধির এই ক্ষণে এসেছে নতুন প্রেরণার দীপ্তি জীবনের মাঝে।
যজ্ঞের নিবেদনের এই সময়ের দীপ্তি হয়েছে স্ফুরিত উদ্বোধনে।।

দৈবী স্বরূপ ঃ অগ্নিঃ মা দুরিষ্টাৎ পাতু সবিতা অঘশংসাৎ।
যঃ মে অস্তি দূরে অরাতিয়তি তম এতেন জেষাং।
স্বরূপ বর্ষবর্ণ এহীমান ভদ্রান্ দুর্যান অভি এহি। মাম অনুব্রতানি উ শীর্ষানি।
মৃঢম ইত্য এহি অদীত এহি সরস্বতী এহি রন্তিঃ এহি অসিরমতিঃ অসি
সুনারিঃ অসি জুষ্টে জুষ্টিম্ তে অশীয়ঃ।। (তৈ. স. ১/৬/৩/১-৩)

অদিব্যের প্রভায় জীবনের জাগরণের বাধা এসেছে যেমনে জীবনের এই পর্বে হোক তার।
পূর্ণতার আর্তি জীবনের চলায় নতুন মাত্রা যোগে এসেছে নিবেদনের এই গভীর পর্ব।
আসুক আকৃতি চলার পথের উদার আহ্বানের যা কিছু হয়েছে আহ্বান।
ক্ষুদ্র প্রকাশের মাঝে এসো তুমি হে অসীম জীবনের সব আকর্ষণ প্রদীপ
হোক সময়ের আহ্বানে চেতনার জাগরণ এখন অসীমের উপলব্ধির জন্য
জগৎ মাঝে রয়েছে যে সব আকর্ষণ প্রদীপ কালের প্রবাহে হয়েছে তার অন্ত এখন।
মানব চেতনের এই জাগরণ ক্ষণ এসেছে দেবী বরণের জ্ঞান প্রভায় সরস্বতী দেবীবরণে।
যখন হয়েছে সময় করতে বরণ তোমারই প্রেরণার বিস্তৃত প্রজ্ঞা প্রবাহে।।

মনোচেতনর জাগরণ ঃ মানুষের সমাজ ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে নিজ নিজ মানবিক পরিচয়কে ভিত্তি করেই। মানুষের রয়েছে বিবেক-বুদ্ধি, বিচারবোধ, যুক্তির পরম্পরা; যুক্তি-বুদ্ধির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বিচারবোধ, এছাড়া মানুষের বিচারবোধ দ্বারা গড়ে ওঠা বিদ্যার প্রভাব। বিদ্যার প্রভায় হয়ে ওঠে কখনও জ্ঞানের সম্ভার। জ্ঞান বিস্তৃত হয়। জগৎ বিষয়ে জ্ঞান ছাড়াও জানবার বিষয়ে নানা ধরনের জ্ঞান সঞ্চয় হয়ে ওঠে। জ্ঞান সঞ্চয় যেটি হয় তারই মূলে কাজ করে মানুষের ইচ্ছা— দৃষ্টিভঙ্গি, মনের গতি-প্রকৃতি ও জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য। জ্ঞানের সীমা মানুষের জানবার স্পৃহা অথবা জানবার পরিধির মধ্যেই থাকে সীমিত। যে পদ্ধতিতে জ্ঞানের অন্বেষণ হয় সেটি ক্রমাগতভাবে জীবনে ব্যাপ্ত হয়ে জীবন ময় হয়ে যেতে পারে যদি মনের আর প্রাণের প্রেরণা তেমনটি হয়ে ওঠে। মনের-প্রাণের প্রেরণার পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে হয় আগামীর অভিমুখে। আগামীর অভিমুখে রয়েছে প্রাণের স্ফূর্তি। মনের মাঝে ফুটে ওঠা জীবনের যে কোন আবেদন সেখানে ফুটে ওঠে।

The idea that the future is unpredictable is under mined every day by the case with which the past is explained our tendency to construct and kkk narrations of the part makes it dificult for us to accept the limits of our forecasting ability. Everything makes sense in hindsight, a fact that financial pundits exploits every thing as they offer convencing accounts of the day's events. And we cannot suppress the powerful intuition that what makes sense in hindsight today was predictable yesterday. The illusion that we understand the past fosters overconfidence in our ability to predict the future.

The offen used image of the march of history inplies order and directions. Marches, unlike stalls or walks are not random. We think that we should be able to explain the past by focusing on either large social movements, cultural and technological developments or the intentions and abilities of a few greatmen. The idea that large historical events are determined by luck is profoundly shocking, although it is demonstrably true.

(Daniel Kahneman, Thinking Fast And Slow, Penguin Books, An Imprint of Penguin Random House, 2011, p. 218.)

মনোবিদ্যার পক্ষ থেকে এটি প্রতিভাত হয়েছে যে মনের মাঝে ফুটে ওঠা ভবিষ্যতের সব সম্ভাবনাকে নিয়ে জীবনের চলার

পথের প্রজ্ঞা সঞ্চার সম্ভব। চলার পথের প্রজ্ঞা জীবনকে ক্রমবিকাশে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ভবিষ্যতের দিকে নিজেরই রুচি-পছন্দের নিরীখে। এমনভাবেই মনের পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত সংবেদ জীবনের জ্ঞান ও কর্ম পথের অভিজ্ঞান হয়ে থাকে সচল অভিযানে সব কর্মের দ্যোতনাকে জীবন মাঝে বিশেষ তাৎপর্যের দৃষ্টিতে। যেমন করে মনের মাঝে গড়ে ওঠা অভিজ্ঞান জীবন পথকে এক বিশেষ খাতে ভরিয়ে দিতে চায়, তেমনই আবার এই মনেরই প্রেরণা ভিন্ন দিকে এগিয়ে যেতে পারে। স্বাভাবিক ভাবনার নিরীখে মন পেতে চায় এক দিব্য পথের সন্ধান। যে পথ দেখিয়ে দেবে কেমন করে অশান্ত মনকে করে তোলা যায় প্রশান্ত। চঞ্চল-অস্থির মন; ক্লান্ত-মনকে স্থিত সন্নিবিষ্ট করে তুলতে পারে এই মন। যে ভাব প্রবাহ একান্তভাবে অনন্তকে জীবনের সীমার মধ্যে বরণ করে নিয়ে চলবে এগিয়ে জীবন পথেই অসীম চেতনকে করে স্পর্শ। এমন করেই হয়ে চলেছে একের পর এক অভিযান। পর্বে পর্বে জীবন হয়ে উঠবে সচল অথচ দৃঢ়; কর্মময় অথচ শান্ত অচঞ্চল; বহুর ভাব হয়ে চলেছে সমন্বিত একেরই ভাব মণ্ডলের মধ্যে। যে প্রাণ প্রবাহ হয়েছিল জীবনের একান্ত অনুগামী হয়ে সমন্বয়ের পথের মাঝে জাগ্রত প্রদীপ আবাহন তেমন করেই হয়ে উঠবে দৃপ্ত বিকাশের অনন্ত ভাবদীপ্তিতে একান্ত অনুসরণ। যে ভাবপ্রদীপ ছিল জীবনের জড় পরিচয়ের অনিবার্য অঙ্গ, তারই এখন বিচ্যুতি এই জড় বিকাশের পথ থেকে। ভগবানের প্রতি যদি গড়ে ওঠে জীবনের আকাঙ্খা তবেই হয়ে উঠবে জীবন মাঝে বরণ করে নিয়ে একান্ত নিবেদনের পথে চলতে এগিয়ে অনাবিল আগ্রহে। এমন ভাবদীপ্তি এসেছে জীবনের মাঝে স্বাতন্ত্রে যারই আবেদন রয়েছে ঐ অনন্ত ভাবপথের মাঝে ভরিয়ে দিতে সবারই চেতন সকাশে। স্বাভাবিক অবস্থায় মনের পরিচয় থাকে সর্বদাই নিরপেক্ষ। মন এই নিরপেক্ষতার পটভূমিতেই ফুটিয়ে তোলে তার পরিবেশসমূহ। বিষয়ের প্রভাব যেমন করে গড়ে ওঠে মনের নিরীখ তেমনই হতে থাকে।

যে মন ভগবানকে চাইবার বিষয় ভাবে ঐ মনেরই মাঝে গড়ে উঠবে ভগবৎ প্রভাবের সংযোগে বিশেষ সব বিষয়াদি। তেমনই চিত্র ভেসে উঠবে মনের পর্বে সর্বদাই গড়ে উঠতে পারে ভাগবতী ভাব। প্রশান্ত-স্থিত হয়ে ওঠে এই মনের মাধুর্য। ভগবানকে বরণ যতই গভীর হয়ে উঠবে ততই হবে মন প্রশান্ত।

রূপে-অরূপে পূর্ণ সত্য ভগবান ঃ

সা মে সত্য অসিঃ। অস্য যজ্ঞস্য ভূয়াৎ আরদত।
মনসা তৎ শকেয়ম যজ্ঞ দিবম্ বোহতু যজ্ঞঃ দিবং।
গচ্ছতু যঃ দেবযানঃ পন্থাঃ তেন যজ্ঞ দেবাং
অপ্যেতু অস্মাসু ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ামে দধাতু।
অস্মান রায় উত যজ্ঞাঃ। সচন্তাম্।। (তৈ.স. ১/৬/৩/৩)

জীবন যজ্ঞ হয়েছে প্রস্তুত করতে নিবেদন তোমারই মনে
যেমনে এসেছে সত্যের আহ্বান করতে বরণ তোমায়
ঐ নিবেদনের এই আকর্ষণ হয়েছে প্রস্তুত যখনই
হবে পরশের ক্ষণ মানব তনু মাঝে দিব্য ভাবে।
দিব্য ভাবনার হয়েছে উদয় ভগবৎ আহ্বান করে বরণ জীবনে।
এখন উপলব্ধির প্রবাহ চলুক এগিয়ে চেতন সহযোগে উর্দ্ধপথে।
যজ্ঞের অভীপ্সা হয়েছে নিবেদন দেবতায় অনুভবের প্রবাহে।
এখন হোক উন্মোচন জীবনের ভাব নির্যাস হয়ে সদাই জীবন সঙ্গী।

দিব্য আলোকমালায় ঃ

অস্মাসু সন্তু আশীষঃ। সাঃ ন প্রিয়া সুপ্র তুতিঃ মখোনি।
জুষ্ঠিঃ অসি জুষ্ঠ নঃ জুষস্ব নঃ অসি কুষ্ঠিং তে
গমেয়ং। মনঃ জ্যোতিঃ জুষতপম অজ্যং বিচ্ছিন্নম যজ্ঞং।
সমিমং দধাতু। বৃহস্পতিঃ তনুস্যাম ইয়ং নঃ বিদ্মে
দেবা ইহে মাদয়ন্তাম্। (তৈ.স. ১/৬/৩/৪-৫)

আলোর প্রদীপ হয়েছে বিশ্বমাঝে মনের অঙ্গনে শিখাময়।
দিব্য ভাব সংবেদ হয়েছে স্থিত মনের মাঝে যেমনই হয়েছে ভগবৎ প্রীতির উদয়।
এখন মনের মাঝে গড়ে উঠবে ভাগবতী ভাবচেতন একান্ত প্রকাশ।
দিবা ভাব এখন হবে সঞ্চারিত ঐ জ্যোতিষ্মান্ মনের প্রবাহ পথে।

প্রদীপ্ত শিখাময় হয়েছে এখন চেতনার সব খণ্ড পূর্ণ অংশ দিব্য ভাবে।
এখন আসুক ভাবরাজ্যে অনন্য চেতনার সংবেদ তোমায় করে বরণ একান্তে।
জ্যোতির্ময় তোমারই দিব্য জ্যোতিপ্রভায় হয়েছে প্রজ্ঞাময় মনের অঙ্গন।
নিবেদনের প্রেরণার পর্ব হোক চেতনস্নাত ভগবানে নিবেদন প্রয়াসে সদাই।

সৃষ্টির অন্তর মাঝে ভাগবতী আহ্বান ঃ

বধ্নপিন্বস্য দদতো মে মা ক্ষয়ি।
কুর্বতঃ মে মোপা দসৎ।
প্রজাপতেঃ ভগো অসি উর্জস্বান পয়স্বান্।
প্রাণঃ অপানঃ। মে পাহি। সমান ব্যানঃ
উদানঃ সমানঃ মে পাহি। অক্ষিতসী অক্ষিতায়ী।
ত্বা মা মে ক্ষেষ্ঠা। অসুত্র অসুষ্মিন্ শ্লোকে। (তৈ. স. ১/৬/৩/৭)

তোমারি সৃষ্টির প্রভা মাঝে এগিয়েছি জীবনে তোমারই কৃপায়।
যা কিছু দিয়েছ জীবনের ধন এসেছে অযাচিতে অন্তর মাঝে তোমায় বরণে।
এখন আসুক দেবতার প্রসাদ ঐ দৃঢ় প্রত্যয়ে জগৎ জনের সেবায় হবে মুক্ত।
করেছি বরণ তোমারই দিব্য ভাব প্রবাহ জগৎ জনকে করে বিপুল আহ্বান।
যে ভাবদৃষ্টির প্রভায় হয়েছে জীবনের ভাব উন্মেষ সদা প্রত্যয় করে অবলম্বন।
নবীন জীবনের আহ্বান এখন হবে পূর্ণ জগৎ জনের সার্থক সহযোগে
যেমন করেই ভগবৎ ভাব নির্মাণ হয়েছে হৃদয় মাঝে।
প্রাণ-অপ্রাণ সমান-ব্যান-উদান মাত্রার সঞ্চালনের এই ক্ষণে।
এখনই এসেছে দিব্য ভাবপ্রবা জীবন মাঝে করতে স্থাপন আলোর মালায়।
দেবচেতনের আর সব দীপ্তির এখন নিত্য দিনের ভাবনার দ্রুত সমাপ্তি।
এখন দেবতার দান, মানবের দিব্য সংসর্গ দিব্যভাব।
পরম চেতনই স্বয়ং হয়েছেন নিত্য বিদার নানা পথ পাশে।
এমন করেই হয়েছে জীবনের প্রসাদ প্রধান অর্ঘ। করি অর্পণ।

অনন্ত ভাবপথে ঃ ভগবৎ পথের অভিমুখি যতই হয়ে উঠবে মন ততই তার মধ্যে গড়ে উঠবে এক প্রশান্ত ভাব। এ প্রশান্ত ভাবই জীবন পথের মাঝে একান্তভাবে উত্থিত এক অনির্বচনীয় বিকাশ ক্ষেত্র। এই বিকাশ ক্ষেত্র জীবনের দৃঢ় ভিত্তির এক একটি প্রবাহকে বরণ করে নিয়ে যায় ঐ অনন্ত আকাশের পটভূমিতে রয়েছে যে জীবন সূত্র তারই উন্মোচনে। জীবনের দীপ্তি ও মাধুর্যের এখন নতুন ভাব প্রকাশ। নবীন ভাব প্রকাশ স্বতঃই জীবনকে ধারণ করতে চায় নবীন কোনও ভাববাতাবরণকে আবাহন করে। বিশ্ব মাঝে বিশ্ব দেবতার এই মাধুর্যমণ্ডিত প্রবাহ হয়ে ওঠে নিত্য পথের অনন্ত দীপ্তি। যেমন করে এসেছে জীবনের মাঝে এই স্বাতন্ত্র তেমনই হবে তার গতিময় প্রভায় এগিয়ে চলা জীবন পথের মাধুর্যে। ঐ রূপবিহীন, কালাতীত অনন্ত চেতনের ভাবস্পর্শ মানব চেতনের মাঝে দেবচেতনের স্পর্শকে সমন্বিত করে জীবনের এই গতিমুখকেই বরণ করে নিতে চায় একান্তভাবে অনন্ত প্রকাশে। দৈবী ভাবের এই অসীমে ব্যাপ্ত মণ্ডলের মাঝে ফুটে ওঠে জীবন মাঝে ফুটে ওঠে একান্ত ভাবনার ও কর্মের দীপ্তি। ভাবনা ও কর্মের এই দীপ্তি জীবন মাঝে আবাহন করে নিয়ে আসবেন বিকাশের ভাবমাধুর্য। এমন করেই হবে জীবন মাঝে পরম চেতনের আবাহন পর্ব নিয়ে এক অপূর্ব ভাব সম্ভার। যে ভাবসম্ভার জীবনের এই ক্ষণপর্বে হয়েছে উন্মোচিত তারই এখন নিত্য ভাব সঞ্চারে জীবন পথে এগিয়ে চলার মধ্যে প্রশান্ত স্থিত মনই হয়ে ওঠে সমন্বয়ী। বিকাশের এই পর্বে মনের বৈচিত্র সাধন হয়ে ওঠে সদা ব্যাপ্ত।

Optimism is normal, but some fortunate people are more optimistic than the rest of us. If you are genetically endowed with an optimistic bias, you hardly need to be told you are lucky porson - you already feel fortunate. An optimistic attitude is largely inherited and is part of a general dispositon of well being, which may also include preference for seeing the bright side of everything. Optimists are normally cheerful and happy, and therefore popular; they are resilient in adapting to failures and hardships, their

chances of clinical depression are reduced, their immune system is stronger, they take better care of their health they feel healthier than others and are in fact likely to live longer.

Optimistic individuals play disproportionate role in shaping our lives. There decisions make a difference; they are inventors, the entriprenurs the political and military leaders - not average people. They get to where they are by seeking challanges and taking risks.

(Daniel Kahneman, Thinking Fast And Slow, Penguin Books, An Imprint of Penguin Random House, 2011, p. 255)

অনন্ত এই জীবনপথ। বিশ্বমাঝে এই সমগ্র জীবন প্রবাহ হয়ে চলেছে অনন্তের এই ভাবদীপ্তিতে ভাস্বর। জীবনের এই ভাববরণ স্বতঃই হয়ে উঠুক জীবন মাঝে স্বতঃ বিকাশী এক দীপ্ত স্পন্দন। যেমনেই এসেছে জীবন মাঝে অনন্তের আহ্বান তেমন করেই গড়ে উঠবে এই জীবন পথের সদা প্রত্যয়ী। জীবন ভগবানকে বরণ করে নিয়ে জগতের মাঝে এগিয়ে জলবার পথে হয় একান্ত বিকাশী অন্বয়। জীবনের এই শাশ্বত প্রবাহ দিয়েছে জীবনময় প্রবাহ এখন জীবনের প্রবাহকে করে তোল এই জীবন প্রবাহকে বরণ করে নিয়ে চলতে এগিয়ে অনন্ত ভাবদীপ্তির সীমান্বিত ভাবপথকে। এমন করেই জীবনের এ ক্ষণপ্রবাহ হয়ে ওঠে স্বতঃবিকাশী অনন্ত ভাববিকাশী। যে ভাবদীপ্তি অসীমের আদি প্রকাশ পর্বের বার্তাকে বহন করে নিয়েছে জীবনের মাঝে এমন করেই হয়ে উঠেছে জীবন মাঝে অনন্ত বিকাশের পর্বে পর্বে। এখন এই জীবন মাঝে ভাব বিকাশ হয়ে উঠবে এখন একান্ত নিবেদনে ব্যাপৃত হয়ে থাকবে যখনই হয় জীবনের প্রয়োজনের নিরীখে গড়ে উঠার এক সূচনা পর্ব। প্রতিদিনের সময়ের সারনিতে এমনই ভাব বিকাশের পর্ব হয়ে ওঠে জীবনের ক্ষেত্র মাঝে নবীনের জাগরণ। এমন জাগরণ পর্ব যার পথ দিয়েই জীবনের স্পন্দন বিশ্বমাঝে হয়ে ওঠে নিত্য বিকাশী। এই নিত্য বিকাশের পথই হয়ে উঠবে জড় বিষয়ের আবর্তে যুক্ত ও আবদ্ধ মনের মাঝে। জড় বিষয়ের আবর্তে হয়ে উঠেছে বন্ধনের যে ব্যাপ্তি তারই এখন জগৎ মাঝে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবার ক্ষণ। যে জীবনদীপ্তি হয়েছে কোনওভাবে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট তারই উন্মেষ হয়ে উঠবে জীবনের চলার পথের এই পাথেয়। ভগবানকে বরণ করে নিয়ে একান্ত বিকাশ হয়ে উঠবে জীবনের মাঝে নিশ্চিত পরিণতির জন্য কর্মের উদ্যোগ। যে কর্ম জগতের; যেটি জগতের কর্ম এখন হবে তারই বিশুদ্ধ-নিষ্কাম দৈবী সত্য বরণের ভাবদীপ্তি। এমন করেই গড়ে ওঠে মনের মাঝে ভগবানের জন্য আবাহন। ভগবান শাশ্বত সনাতন নিরঞ্জন নিরুপাধি হয়েও হয়ে উঠবে এক দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ দীপ্তি জীবন ভাবদীপ্তি। এই ভাবদীপ্তি অসীমের মহাকাশে যেন সীমায়িত এক একটি নক্ষত্রের দীপ্তি। জগৎময় এই ভাবদীপ্তি ব্যাপ্ত হয়ে ফুটে উঠবে নির্মল প্রশান্ত দৃঢ় প্রত্যয়ী ঋতবিকাশ জগতে।

সাধন অগ্নিতে দৈবী পূজার ডালি ঃ

বর্হিষো অহম দেবয়জ্যায়া প্রজাবান্ ভূয়াসং।
নরাশং সস্য অহম্ দেবয়জ্যায়া পশুমান্ ভূয়াসং।
অগ্নেঃ স্বিষ্টকৃত অহম্ দেবয়জ্যায়া আয়ুষ্মান্। (তৈ. স. ১/৬/৪/১-৩)

পূজার ডালি এনেছি এখানে শ্রীভগবানচরণ অর্পণে।
এখন হোক প্রসারিত নিবেদনের অর্ঘ দেবতার প্রতি।
পরম্পরায় হোক সঞ্চার দেবচেতনের প্রতি নিবেদিত আহ্বান।
মানব চেতনের অধিকার করে অতিক্রম চলেছি এগিয়ে।
দেবচেতনের পথ অভিযানে নিত্য দিনের পূজার নিবেদন
অবনত এই চেতন সংগা দেবতার পথের নিত্য আবাহনে।
হয়েছে যজ্ঞের বেদীর সংস্থান সত্যের প্রদীপ করে অর্পণ।
ভগবৎ ভাবপ্রদীপ এখন হয়েছে শিখাময় করতে ব্যাপ্ত জগৎময় আলোক।

মানবজীবনে দৈবী প্রজ্ঞা সঞ্চার ঃ

অগ্নে অহম উৎ জীতম্ অনু উৎ জেষং।
সোমস্য অহম্ উৎ জিতিম্ অমে অহং।
উৎ জিতিম্ অনু অগ্নি সোমায় অহম অনু ইন্দ্রাগ্নিঃ।
অহম উৎ জিতিম অনু মহেন্দ্রস্য অহম্ উৎ জীতম্ অনু।
অগ্নে স্বিষ্টকৃতো উৎ জিতিমন অনু।। (তৈ. স. ১/৬/৪/৪-১১)

তোমার অগ্নিরূপের প্রকাশ এনেছে জীবনের বার্তা।
নতুনের আবির্ভাব এই চেতনে এখন সোম প্রকাশ স্পন্দন।

এখন সাধন চেতনের নিত্য ভাবপ্রদীপ হয়েছে অনিবার্য চেতন স্পন্দন।
অগ্নির তাপন এনেছে বিশুদ্ধি সুষমা মণ্ডিত জীবন প্রবাহ।
শান্ত সমাহিত এই অনন্ত ভাবপ্রবাহ হোক দৃপ্ত জীবন ব্যাপ্ত।
ভগবৎ ভাব প্রভা করে আশ্রয় হৃদয় মন্দিরে সাধন মন্ত্রের আহুতি।
এখন নবীন জীবনের নবীন চেতন পরশ হোক জীবনের আশ্রয়।
অচঞ্চল এই চির উন্মেষী ভাববিকাশ আনুক ব্রহ্ম স্পন্দন জীবন মাঝে।

ব্যাপ্ত বিশ্বচেতন ঃ মনের মাধুর্য ফুটে ওঠে মনের প্রশান্তি ও একাগ্রতার পথে। মনের প্রশান্তির রূপ ভাস্বর হয় যদি মনের মাঝে ফুটে ওঠে একান্ত ভাববিকাশি এক অন্বয় সূত্র। অন্বয়টি সৃষ্টি হয় বিষয়ের সঙ্গেই। যে মন ভগবানে নিবেদিত তার মাঝে এখন অন্বয়ের যোজনায় ফুটে উঠবে দৈবী ভাব, এই দৈবী ভাবের মৌল তাৎপর্য হল জীবনে সত্য ও ঋতের অনুধাবন ও পালন অনিবার্য করে তোলা। মনের মাঝে জড়ের পরিবর্তে যখন হয়ে ওঠে দৈবী ভাবের বরণ, মনের চরিত্র বদল হয়ে যায়। দৈবীভাব হল সত্যের ভিত্তি আর ঋত পালন। ভগবানকে অন্তরমাঝে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ঐ অনির্বচনীয় পরমের স্পর্শে, দর্শনে বা অনুভবে হয়ে উঠতে ভরপুর। জীবনের এমন ক্ষণ হয়ে ওঠে প্রাণের মাঝে এক নবীন চেতন সম্পদ। এই নবীন চেতন সম্পদই হল ভাগবতীচেতন। বিশ্বমাঝে বিশ্বনাথের প্রাণ স্পন্দনের সূচনায় হয়েছিল এই চেতন রচনা। বিশ্বব্যাপ্ত সব প্রাণের অভ্যন্তরে আত্মার অবয়বে এই চেতনাই রয়েছে স্থিত, ধ্রুব। এই চেতনই পরমের জীবন মাঝে স্পন্দনের মাত্রায় বিরাজ করে। এই চেতনই হয়ে রয়েছে যোগে যুক্ত ভগবানের সঙ্গে সদাই।

দিব্য চেতন জীবনে বরণের মধ্য দিয়ে ভগবানকে সাদরে বরণ করা হয়। এমন করে যার ফলে নিত্য সনাতন তিনি জীবনের চারিত্রিক সম্পদের সূত্র হয়ে উঠবেন। ভগবানকে হৃদয় মাঝে বরণ করে নেবেন ভক্তজন। জীবনের সব সমন্বয়ী জড় চেতনের ক্রম রূপান্তরের পথে দিব্য চেতনকে বরণ করে প্রজ্ঞা সঞ্চয় করবেন। আর গভীর গাঢ়তায় হয়ে উঠবেন প্রজ্ঞাবান। এমন করেই জীবনের পথে চেতন সম্পৃক্ত হয়ে এগিয়ে আসবেন ব্রহ্মচেতন হয়ে প্রজ্ঞাস্বরূপ। অন্যভাবে ভাগবতী চেতনই অনুক্ষণ প্রেরণার প্রদীপ হয়ে মনের সব অঙ্গনের রাজা হয়ে রাজবৃত্তে মনের পরিধিকে বিস্তার করে এগিয়ে চলবেন অনন্ত বিকাশী একান্ত নির্ভর নিজ চেতন পথের অনুগামী জগৎ বিস্তারে। মনোচেতন এখন দৈবী ভাবদৃপ্ত হয়ে জগৎ কর্মের মাঝে হবেন আবিষ্ট। জগতের সব কর্মই এখন হয়ে উঠবে ব্রহ্মকর্ম। নিষ্কাম-বিশুদ্ধ-নির্মল মনের বাতাবরণ ক্রমে কর্মমুখর হয়ে উঠবে। এই কর্ম জগতের; অথচ ভগবৎ সেবায় নিবেদিত। এই জগৎ কর্মপ্রবাহ ভগবৎ প্রেরণায় কৃত। ভগবানই এই কর্মের অঙ্গে অঙ্গে বিরাজমান হয়ে কর্মকে দিব্যকর্ম রূপায়িত করবেন। শাশ্বত সনাতন এই ব্রহ্মচেতনের ভক্তি আস্বাদন, প্রজ্ঞাচয়ন ও দিব্যকর্মের পথে বিশ্বচেতনকে করবেন বিশ্বব্যাপ্ত। বিশ্বনাথের এখন বিশ্বপ্রকাশ।

—ঃঃ—

শিল্পী

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

রঙ তুলির কারবারি আমার
সকাল থেকে দুপুর আরও পরে অপরাহ্নের হলুদ
পশ্চিমের রক্তরাগ ঘরেফেরা পাখির উড়ন্ত ডানায়
আমার দিন যে যায়
রঙ তুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াই অরণ্যে পর্বতে
পুবের আকাশে লাল বিন্দুটির সাথে
কখনও গভীর রাতে নক্ষত্রের নীলে
তবুও মনের মতো হচ্ছে কই
ফুল পাখি বৃক্ষ সহস্র বেষ্টনীতে বৃক্ষলতা
তোমার সৃষ্টি আর আমার দৃষ্টির
মাঝে বিস্তর ব্যবধান
তোমার সৃষ্টিতে বিভোর তুমিই পূর্ণ
এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আর তার নিখুঁত বিন্যাসে
রঙ তুলির এমন সঠিক প্রয়োগ কে দেখেছে আগে
হে ঈশ্বর তুমিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী
তোমারই কারুকার্য সুসামঞ্জস্যে তুমি মহান।

—ঃঃ—

খুঁজে নাও জীবনের অভ্যন্তরে ভগবৎ ভাবচেতন্

তনিমা চ্যাটার্জী

কিসের জন্য এই জীবন? এই জীবনের উদ্দেশ্যই বা কী? জগৎ-এর প্রেক্ষিতে জীবন এগিয়ে চলে তার নিজস্ব ছন্দে, নিজস্ব গতিতে। এই ছন্দ, গতি বা অভিমুখ নির্ধারিত হয় জগৎ-এরই প্রেক্ষিতে। জাগতিক ভাবে প্রতিটি জীবন চিনে নেয় তার আপাত পরিচয়। সেই পরিচয়কেই আধার করে বেড়ে ওঠা জীবনের। জীবন ধীরে ধীরে নির্ধারণ করে নেয় জগৎ-এ তার পরিচয়টি ঠিক কী? কী বাত তার পরিধি? এই পরিধির অভ্যন্তরে কারা অবস্থান করে? জীবনের সামাজিক পরিচয়ই বা কী? জীবন কী কী সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ? কী-ই বা তার সামাজিক কার্য প্রণালী? তার কর্মকাণ্ডের ভিত্তিই বা কী? এই কর্মকাণ্ডকে ঘিরে রয়েছে অনেক প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, আশা-আকাঙ্খা, লাভ-ক্ষতি, উন্নতি আরো কত কী? জীবন তার নিজ বৃত্তের মধ্যে থেকেই জানতে চায়, বুঝে নিতে চায় তার সামাজিক পরিস্থিতি। তার আর্থিক সম্মান, সমাজের প্রতিপত্তির নিরীখেই বিচার হয় সেই ব্যক্তি জগৎ-এর কোন থাকে রয়েছেন। জগৎ কতগুলি বিষয়-এর ভিত্তিতে নির্ধারণ করে ব্যক্তির মূল্য, যেমন ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থিক বৈভব, কারীগরি বিদ্যা, জনপ্রিয়তা ইত্যাদি। কিন্তু এই মহাবিশ্বে যতই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই হোন না কেন আবার যতই ক্ষমতাহীন ব্যক্তিই হোন না কেন, কেউই চিরন্তন নয়। ক্ষমতার আস্ফালন, আর্থিক প্রতিপত্তি, সামাজিক সম্মান, পদের পদমর্যাদা, সম্পর্কের সুখ বা আঘাত, শারীরিক সৌন্দর্য্য বা অসৌন্দর্য্য, সামর্থ্য বা অসামর্থ্য সবই কালের নিয়মেই বাধা। সব কিছুরই মালিক সেই মহাকাল আর এই পরম সত্যকেই ভুলে বসে আছে জীবন। জীবন ভেবেই নিয়েছে যে সে নিজেই তার মালিক, আর আসল মালিক রইলেন অভ্যন্তরে, অন্তরালে, নীরবে। কালের কাল পথে জীবন আবর্তিত হয়ে চলেছে কর্ম-কর্মফলের আবর্তনে। ভগবান সৃষ্টির আদিতে রচনা করে দিয়েছে কর্ম-কর্মফল চক্র, দিয়ে দিয়েছেন স্বাধীন একটি করে মন। এবার জীবনের বিচারের পালা। যেমনটি কর্ম করা, ঠিক তেমনি ফল লাভ। এ তো অনিবার্য। এই চক্রে ফাঁকি দেওয়ার কোন উপায় নেই। মহাকাল তার কালের রথে যা যা প্রদান করেছেন তার সমস্ত হিসেবই রয়েছে ওই মহাশূন্যে। কেউ একজন নীরবে বসে আছেন কর্মফল দায়িনীরূপে। তুমি যা করবে, তুমি যার যোগ্য তা তুমি অবশ্যই লাভ করবে, তা ভালো-মন্দ যাই হোক না কেন। তার থেকে অন্যথা হতে পারে না একমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। সেই বিশেষ ক্ষেত্রগুলি আর কিছুই না, ভগবানের নিজস্ব ক্ষেত্র। যে জীবন ভগবানের আশ্রয় নিয়েছে, সত্যি সত্যিই নিবেদিত হতে পেরেছে, সেই জীবনই কর্ম-কর্মফল চক্রের বাইরে গিয়ে ভগবৎ জীবন-এর অধিকারী হয়েছে। কেউ হয়তো মনে মনে চিন্তা করছে ‘ ও পেল, আমি পেলাম না’। বা ‘ওর হলো, আমার কেন হলো না?’ ‘আমার সাথেই বা কেন এমন হয়’, এই সব প্রশ্নের উত্তর-ই জীবনকে খুঁজতে হবে নিজের মধ্যে। নিজেই তার সবচেয়ে বড় উত্তর। অন্য কারুর দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। সে পরিচিত ব্যক্তিই হোক বা অপিরিত কেউ। হয়তো বা খুব কাছের কেউ, বাবা, মা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী কিংবা সন্তান সবাই আপাতভাবে রয়েছেন একই-সাথে হয়তো বা একই সাথে পথ চলছেন। আপাতভাবে একই অভিমুখে পথ চলা মানুষগুলিরও পরিণতি ভিন্ন। কারণ তাদের অজান্তেই তাদের যাত্রাপথগুলি হয়ে ওঠে অনন্য। প্রতিটি জীবের যাত্রা একান্তই তার নিজস্ব, এই ক্ষেত্রে আর কারুর কোনো অবদান বা কোন সাহচর্য নেই। মায়ের কোলে যে সন্তান এসেছে, আপাতভাবে মনে হতে পারে সে বড় আপন, নিজের বা শরীরের অংশ কিন্তু বাস্তবে সেই সন্তান নির্বাচন করে নেবে তার গতিপথ আর তার নিজস্ব নির্বাচনটুকুই তাকে নিয়ে যাবে তার গন্তব্যে। যা চেষ্টা করতে পারে হয়তো বা পথ দেখিয়ে দিতে পারে কিন্তু যাত্রা তার নিজস্ব। সে এই জীবনে আসার আগেই অনেক অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে, যে পথে তা এই ‘জৈবিক মা’ হয়তো কোথাও ছিল না, আবার ওসে আরো অনেক পথই হাটবে যেখানেও এই বর্তমান মা থাকবেন না। এই মা-সন্তান-এর সম্পর্কও জগৎ-এরই অবস্থা, এক মহাকালের কালপথে ঘটে চলা এক ঘটনা মাত্র। কিন্তু যদি দুটি জীবনই ভগবানকে বরণ করে নেয়, যদি ভগবৎ জীবন যাপন করে যুক্ত হতে পারে, যদি কর্ম-কর্মফল চক্রকে ভেদ করে ভগবৎ বৃত্তে স্থান করে নিতে পারে তবে চির অপরিচিত দুটি জীবন হলে উঠতে পারে খুবই আপন। তকন দুটি জীবন আর ভিন্ন অস্তিত্বে, ভিন্ন পরিচয় থাকে না, মিশে যায় মহাকালে পরিচয় হীন হয়ে।

তাই তো ঠাকুর বললেন ‘জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ’। কী এই ‘ভগবান লাভ’? জীবন একটি ফুলের মতো যা এই সৃষ্টির স্বরূপ বৃক্ষে প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। সেই ফুলের পরিণতিও নানা প্রকারের হতে পারে, তাতে ভগবানের কোনোই হস্তক্ষেপ নেই। কিন্তু যদি সেই ফুল নিবেদিত হতে পারে ভগবৎ চরণে তবেই তার সার্থকতা। জীবন-এর ক্ষেত্রটিও ঠিক তাই হয়ে রয়েছে। জীবন ভগবানকে গ্রহণ করল কী করল না তাতে ভগবানের কিছুই এসে যায় না। তিনি স্বতসিদ্ধ, স্বয়ং সত্য স্বরূপ,কেউ সেই সত্যকে চিনল কিনা তাতে সত্যের কোনো তফাৎ হয় না। কিন্তু যিনি সেই পরম সত্যকে জানতে পারেন, তিনি সত্য লাভ করেন, তিনিই হয়ে ওঠেন ব্রহ্ম জ্ঞানী। তিনি ভগবানকে লাভ করে স্বয়ং হয়ে ওঠেন সত্যস্বরূপ, চৈতন্যময়, তখন আর তার জাগতিক পরিচয়টি বাহ্যিক পরিচয় হয়ে থেকে গেলেও অন্তরে সেই ব্যক্তি ভগবৎময় হয়ে জগৎ-এর প্রেক্ষাপটে এক জন ভগবৎ-কর্মী রূপেই অবস্থান করেন। তিনি যে কাজই করুন না কেন যদি তিনি এইটুকু জানেন যে এই জীবনটা ভগবানেরই দান, এই জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে

দিয়ে উপলব্ধিতে তাঁকেই চিনে নিতে হয়, জেনে নিতে হয় তবে তিনি একজন ভগবৎ কর্মী হয়েই জীবনের মাঝে অবস্থান করে আছেন।

ভগবানকে অনেকবার বলতে শুনেছি যে ভালো আর মন্দের মধ্যে তফাৎ বড়ই কম। তিনি এও বলেন যে জগৎ-এর এমন কোনো প্রেক্ষাপট হয় না যেখানে যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে ভগবানকে লাভ করা যায় না। যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো অবস্থাই ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারেন। জগৎ-এর নিরীখে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি আর অশিক্ষিত ব্যক্তির অনেক তফাৎ। জগৎ তার শিক্ষার নিরীখেইতার মূল্য বিচার করে। কিন্তু ভগবান শিক্ষার বিচারে নয় বরং চেতন অবস্থার নিরীখেই মূল্য বিচার করেন। একজন সমাজের উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যদি মনে করেন যে তিনিই অনেক কিছুর মালিক, তাঁর অনেক ক্ষমতা তিনি অনেকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তিনিই নির্ধারণ করতে পারেন জীবনের সবকিছু, তবে আপাতভাবে যদিও মনে হয় যে তিনি জগৎ-এর সমাজের মধ্যে একজন বিশাল গণ্যমান্য ব্যক্তি কিন্তু বাস্তবিকরূপে আদি অনন্তকাল ধরে যে চেতনার জাগরণের জন্য যাত্রা হয়ে চলেছে, যে যাত্রায় প্রতিটি জীবই মহাকালের কালস্রোতে জীবাত্মারূপে যাত্রী হয়ে রয়েছেন সেই যাত্রার নীরিখে বিচার কবলে সেই ব্যক্তি হয়তো এখন অনেক অনেক পিছনে পড়ে আছেন। আবার হয়তো আরেক মানুষ কায়িক পরিশ্রম করে চলেছে প্রতিদিন, হয়তো বা তার কোনো সংস্থানই নেই। হয়তো বা মানুষটি এক অত্যন্ত অশিক্ষিত (আপাতভাবে) অক্ষমতাশালী একজন ব্যক্তি, এই সমাজের নীরিখে জগৎ-এর মাঝে তার দাম হয়তো খুবই সামান্য কিন্তু তিনিই হয়তো হয়ে রয়েছেন ভগবান-এ নিবেদিত। তিনিই হয়তো অটল বিশ্বাসে এই সার কথা জেনেছেন যে তিনি ভগবানের উপর নির্ভর করেই জীবন যাপন করছেন, তাঁর জীবন ভগবানই চালাচ্ছেন। ভগবানই জীবনের রাজা হয়ে রয়েছেন তবে সেই জীবন অনেক অনেক বেশী করে যুক্ত হয়ে আছে ভগবানের সাথে, মহাকালের কাল রথে তিনি অনেক অনেক এগিয়ে আছেন আপাতভাবে ওই ক্ষমতাশালী ব্যক্তির থেকে। তবে ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য, অর্থ, মান-সম্মান,সামাজিক প্রতিপত্তি, সামাজিক শিক্ষা এর কোনোটাই যেমন ভগবান লাভের যে ব্যক্তিকে এগিয়ে দিতে পারে না, ঠিক তেমনি এই বিষয়গুলিও ভগবৎ লাভে অন্তরায়ও হতে পারে না। জাগতিক প্রেক্ষাপট ভগবান লাভের সঙ্গে নিরপেক্ষ হয়েই অবস্থান করে। ভগবান লাভের জন্য এক মাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু হল ব্যক্তির মন, প্রাণ ও হৃদয়। যা ব্যক্তির চেতন সত্তাকে জাগিয়ে দেয়। যে মন ভগবানকে অনুভবে, উপলব্ধিতে ধারণ করতে শেখায়, যে মন ভগবানের কথা ভাবতে শেখায়, যে মনে ভগবানের লীলাস্মরণ হয়, যে মন নিত্যই ভগবৎ ভাবে হয়ে থাকে নিমজ্জিত সেই মনই নিবেদিত হয় ভগবৎ চরণে, সেই মন, প্রাণের স্পন্দনে ছড়িয়ে দেয় ভগবৎ ভাব, প্রাণের কোষে কোষে ছড়িয়ে যায় ভগবৎ চেতনা, জীবন আবিষ্কার করে হৃদয় মাঝে তার হৃদয়রাজকে। হৃদয়ই প্রথম চেতন স্থান যে ভক্ত-ভগবান মিলিত হন এবং তারপরেই সূচনা হয় যাত্রার, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করে জীবনপথে এগিয়ে চলা। এই অবস্থায় ব্যক্তির জীবন হয়ে ওঠে ভগবৎ জীবন, যে জীবনের একান্ত আপন হয়ে বিরাজ করেন ভগবান স্বয়ং। সেই জীবনের বাহ্যিক পরিচয়টি মূল্যহীন।

যে জীবন হতে পেরেছে ভগবৎভাবে নন্দিত, যে জীবন, জীবনের অভ্যন্তরে খুঁজে নিয়েছে ভগবৎ অস্তিত্ব, যে জীবন হতে পেরেছে ভগবানের নিত্য সঙ্গী সেই জীবনের ভার নিয়েছেন ভগবান স্বয়ং, সেই ভার টুকু শুধু যে জগৎ-এর পথে হাত ধরে নিয়ে চলেছেন তাই নয়, মহাকালের কালপথেও ভগবানই হয়েছেন নিত্য সঙ্গী, তিনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন তাঁরই প্রিয় জীবনকে তাঁর উদ্দেশ্যে। তিনিই যদি দেখিয়ে না দেন চিনিয়ে না দেন তাহলে তাঁকে চিনবে, জানবে, সে সাধ্য কোথায় জীবনের মাঝে। ভগবৎ অভিপ্সা জাগ্রত হলে, চাওয়ার মতো করে তাঁকে চাইতে পারলে, তিনি ক্রমে হাত ধরেন। হাত ধরে নিয়ে চলেন তারই অভিমুখে। তখন জীবনটি হয় একেবারেই অন্যরকম। সে জীবন যে কাজই করে, সে জানে যে যে ভগবৎ কর্মই করছে। তার কাজের উদ্দেশ্য ভগবানকে নিবেদন, তাই তার কাজই হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ কাজ। তিনি শ্রেষ্ঠত্বের অভীলাষ হন না, কিন্তু তিনি হয়ে ওঠেন নিত্য প্রয়াসী। তিনি জানেন যে তিনি যে কাজের মধ্যে আছেন তা ভগবানেরই দান, তাই তিনি সর্বশক্তি দিয়ে প্রয়াস করেন তাকে সঠিকভাবে সম্পাদন করতে। তিনি যখন কর্ম করেন, দায়িত্ব পালন করেন তখন তা সর্বচ্চ নিপুণতার সাথেই করেন কারণ তার কাছে তার কাজই ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে তাঁকে। তিনি কর্ম ত্যাগী হন না বরং তিনি হয়ে ওঠেন নিত্য কর্মী, শ্রেষ্ঠ কর্মী।

এমনটাই ছিল আমাদের বৈদিক সভ্যতার পরম্পরা, যেখানে প্রতিটি জীবনই ছিল ভগবৎ কেন্দ্রিক, সেখানে যে যে কাজের মধ্যেই থাকতেন না কেন, ভগবানকে ধারণ করেই করতেন সবকিছু। ভগবানকে ধারণ করেই ঋষিরা ডুবে থাকতেন উপলব্ধিতে। সেই উপলব্ধিই তাঁরা জাগিয়ে তুলতেন, পাঠ দিতেন শিষ্যদের। শিষ্যরা নিজ নিজ উপলব্ধি, অধ্যায়ন, অধ্যাস-এর মধ্য দিয়ে তারাও হয়ে উঠতেন এক একজন ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি। রাজারাজ্য পাঠ চালাতেন ভগবানকে জীবনের মাঝে বরণ করে, ব্যবসা করতে ভগবৎ ভাবকে আশ্রয় করে, কৃষক মাঠে ধান বুনতেন ভগবানকে জীবন মাঝে ধারণ করে, যোদ্ধা যুদ্ধ করতেন ধর্ম প্রতিষ্ঠার্থে। অর্থাৎ যে কাজই ব্যক্তি করুন না কেন কাজের উদ্দেশ্য ছিল সবক্ষেত্রেই এক। ভগবানে যুক্ত হওয়া , ভগবানই থাকতেন মূল কেন্দ্রবিন্দুতে আর তাঁকে ঘিরেই গড়ে উঠত সমাজ, সংসার সমস্ত চলন দেন। তাই সেই সমাজ ব্যবস্থাই ছিল ভগবৎ ভাবে পূর্ণ—যা সমস্ত

ভেদাভেদ রহিত। যার মূলে ছিল সাম্যাবস্থা একমাত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ভগবৎ নিরীখেই। যদি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করা যায় যে সবকিছুর মধ্যে তিনিই স্বয়ং অবস্থান করে আছেন সবার মধ্যে তাঁরই অধিষ্ঠান। তাঁর ইচ্ছাতেই জগৎ-সংসার নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে। তিনিই সবকিছুর মালিক। এ জীবন ও তাঁর সাথে যুক্ত হওয়া একটি সুযোগ মাত্র তখন আর বাকী সবকিছুই হয়ে যায় মূল্যহীন। জীবন তখন একমাত্র খুঁজে চলে কিভাবে তাঁর সাথে যুক্ত হয়ে থাকা যায়। আর তখনই জীবনটি স্বয়ং হয়ে ওঠে সাধন ক্ষেত্র। আর সাধন অগ্নিরূপে অবস্থান করেন তাঁরই আরাধ্য জীবন মাঝে। আহুতি হতে থাকে সব স্মৃতি, চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছে, সৎকর্ম, জীবন যত বেশী করে তাঁকে নিবেদন করে, যজ্ঞাগ্নি ততই প্রকট হয়ে জ্বলতে থাকে।

হে প্রভু জীবনকে করে তোলো এক সাধন যজ্ঞ, যে যজ্ঞে পুরোহিত হয়েওঠো তুমি স্বয়ং, হয়ে ওঠো সেই অগ্নি স্বয়ং যে অগ্নি জীবনকে করবে শুদ্ধ, গড়ে দেবে ভাগবতী রূপে।

ওঁ নম শিবায়ঃ নম শিবায়ঃ নম শিবায়ঃ।

—ঃ—

হোক ভগবৎ বিশ্বাস পরম দৃঢ়

সায়ক ঘোষাল

ভাগবতী পূর্ণ জীবনই গড়ে তুলতে পারে ভাগবতী চেতন স্বত্তা সমাজের কেন্দ্রে। মনটিতে ভগবান দিয়েছেন ইচ্ছার স্রোত, এই ইচ্ছাই জীবনে শ্রেয় ও প্রেয়কে বেছে নেয় অন্তররাজ্যে। তাই যে মন নিজের ইচ্ছায় ভগবানে নিবেদিত হয়ে কর্মপথে এগিয়ে যাবে সেই মন হয়ে ওঠে ভাগবতী মন এই মনই প্রাপ্ত হয় ভগবৎ-চেতন স্বত্তা। ভক্তমন প্রজ্ঞাকে আহরণ করে আরও ভগবানে মিলে যাওয়ার জন্য। ভগবৎ বিশ্বাসে এসেছে নিত্য আহ্বান। এই নিত্য আহ্বানে অন্তরে এখন জেগে উঠবে অগ্নির দীপ্তি জীবন মাঝে। এই অগ্নির দীপ্তিতে জীবন হবে পরম চেতনের পরশ। এইভাবে নিত্য নিবেদনে নিত্য চেতনের জাগরণে হবে নিত্য বিকাশ মাঝে। এই নিত্য বিকাশের মাঝে দিব্য সংবেদ হবে দিব্যতায় স্নাত এই জীবন। মহাকালের এই কালের পটভূমিতে এই ভক্তমন এখন এগিয়ে চলবে দিব্য জীবনের প্রত্যয় নিয়ে। এই প্রত্যয়কে জীবনের ভীত করে ভক্ত মন এগিয়ে চলবে দিব্য কর্ম পথে। কর্মের প্রভায় নিত্য ভগবৎ ভাব আরো নবীনভাবে উন্মোচিত হয় অন্তর মাঝে। এই পথে জীবনে সঞ্চারিত হতে থাকে ভাগবতী প্রভা। ভগবৎভাব স্রোতে যে আহ্বান এসেছে সেই কর্ম পথেই হবে মূর্ত অন্তর মাঝে। ভক্তির সংবেদ এবং কর্মের প্রভায় দাও হে মন নিবেদন ভক্তির পুষ্প ভগবৎ চরণে। জীবনের সত্য এখন শুধু একই প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে বাহ্যিক সব সত্যকে অতিক্রম করে। এই ভগবৎ আহ্বানের পর্বে ভক্তমন সদা সর্বদা নিবেদিত মনে সদা জাগ্রত চেতনে করবে সাধন মনের কেন্দ্রে জগতের কেন্দ্রে। ভগবৎ আহ্বানেই ভগবৎ কৃপা একান্ত গোপনে করছে প্রকাশ ভগবৎ স্বত্তা অন্তর মাঝে। ভগবানকে জানার পথে এগিয়েছে মন ভগবানেরই প্রকাশের আলোয়। মহাকালের এইকালের পটভূমিতে এখন ভক্তমন মহাকালের প্রকাশেই নতুন করে জাগিয়ে তুলবে ভগবৎ চেতন ধারা এবং ভক্তমন নতুন করে উন্মোচন হবে। যে ভাব ছিল এত সময় থাকত ধীর স্থির সুপ্ত মনের কেন্দ্রে, সেইভাব সেই ব্রহ্মচেতন ভাব জেগে উঠবে জগৎ পটে এবং জগৎকে উদ্ভাষিত করবে নতুন ব্রহ্মচেতন ধারায়। এই ব্রহ্মচেতন ধারায় বিশ্বাসই হল স্তম্ভ। বিশ্বাসটি হতে হবে নিরেট। বিশ্বাস এমন হতে হয়—যে বিশ্বাসের কোনো চোখ থাকবে না। না থাকবে বিচার বিবেচনা বোধ না থাকবে ঠিক বেঠিক ভাবনা চিন্তাধারা। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হতে হবে এমনই। এমন সরল মনই যে মনে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ভালোবাসা থাকে এই মনই সরল মন। এই সরল মনই একজন প্রকৃত ভক্ত হয়ে ওঠে। এইরকম সহজ সরল বিশ্বাসে ভরপুর ভক্তের ভালোবাসা ভক্তিতে ভগবান তাঁর ভক্তের সম্পূর্ণ জীবনটা জুড়ে অবস্থান করেন, যা কিছু হয়ে চলেছে জীবনের কর্ম, যা কিছু এগিয়ে চলেছে জীবনের মাঝে সবের মধ্যে ভগবান এক এবং অভিন্ন হয়ে থাকেন, এই ভক্তের কাছে। ধ্যানের গভীরে ভগবৎ সান্নিধ্য পাওয়া যায়। কেউ যদি ভাবে ভগবৎ সান্নিধ্যের জন্য কোনা পরিবেশ বা স্থিত-অস্থিত্বের প্রয়োজন এটি সম্পূর্ণ সত্য নয়।

এই রকম সহজ সরল বিশ্বাসে ভরপুর মনের অধিকারী ভক্ত তার ধ্যানের মধ্যে খুঁজে পায় তার ভগবানের সান্নিধ্য। ভক্ত যত-ধ্যানে মগ্ন অবস্থায় থাকে পরম চেতনের সঙ্গে, তত ভক্ত ভগবানের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠে দিনের পর দিন। ভক্ত প্রতিনিয়ত গ্রহণ করতে থাকে ভগবৎ প্রজ্ঞা। ভগবানকে জানার আগ্রহে আরও নতুন নতুন রূপে ভক্তের কাছে ফুটে ওঠে ভগবৎ তত্ত্ব। এই অগ্নিময় ধ্যানের প্রভায় ভক্তমন হবে অগ্নির মতো পবিত্র দৃঢ়। এই ধ্যানের দীপ্তিতে ভক্তের ভাবনা প্রকাশ ঘটবে নিত্যই। এই নিত্য নবীন ভাবনার প্রকাশ এবং ভগবৎ সান্নিধ্য আনবে দেবপ্রজ্ঞা জীবনমাঝে। ভক্তের রক্তে রক্তে কোষে কোষে বয়ে চলবে এই দেবপ্রজ্ঞার শিহরণ। উন্মুক্ত চেতন এখন হবে উন্মোচন উর্দ্ধগামী। চেতন স্রোতে এখন শুধু হোক ভগবৎ লাভের অভীপ্সা। এই উন্মোচিত চেতন স্বত্তাই এখন মানবিক সীমা অতিক্রম করে ক্রমশ উর্দ্ধে উন্মোচিত হবে ব্রহ্মলাভের অভীপ্সায়।

—ঃঃ—

দেবভূমি ভারতবর্ষ

রীতেন বসাক

ভগবান শাশ্বত ও সনাতন। তিনি সময়ের উর্দ্ধে। সময়ের স্রষ্টা। তিনি নিয়মের উর্দ্ধে কিন্তু নিয়মের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। এই মহাবিশ্বের সকল কিছুই চলছে তারই সৃষ্ট নিয়মে। জগৎ এ এমন কিছু নেই যা তাকে ছাড়া বা তার গোচরের বাইরে। তিনিই গোটাগুটি। আর যা কিছু আছে দৃশ্যত বা অদৃশ্য সবই তার অংশ মাত্র। প্রাণের মধ্যেও সকল প্রাণর মাঝে তার উপস্থিতি। তাই তিনি হলেন মহাপ্রাণ। আর সকল প্রাণ তার থেকেই জাত। যেমন সকল কণার মধ্যে মৌলিক কণা ঈশ্বর কণা বর্তমান, তা বস্তুর আকার, আয়তন, অবস্থা (কঠিন, তরল, বায়বীয়, প্লাজমা) বা ধাতু যাই হোক না কেন ঈশ্বরকণা সবেতেই বর্তমান। ঈশ্বরকণা বা হিগস-বোসন গড পার্টিকেল আধুনিক বিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার এবং সর্বজনগ্রাহ্য। যদিও এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীই পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাদের স্বীকৃতিতেই গোটা বিশ্ব জানতে পেরেছে এবং মেনেছে। পদার্থের ভেতর যদি ঈশ্বরকণা থাকতে পারে তবে প্রাণের ভেতর ভগবান নয় কেন! ঋষিরা বল্লেন আলবাৎ রয়েছেন ভগবান সকল প্রাণের মাঝে আত্মরূপে। ঐ আত্মাই ভগবানের সাথে পার্থিব প্রাণের যোগসূত্র। ঐ পার্থিব প্রাণ, ধরে নিলাম এক্ষেত্রে মনুষ্য প্রাণ, যখন নিজের আত্মার প্রাণ, ধরে স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হয় তখন তার হয় ভগবান দর্শন বা ভগবানের উপস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান। এটি যে কোন মানুষই অভিজ্ঞতা করতে পারেন। এর জন্য কোন ল্যাবটোরির প্রয়োজন হয় না। এটি সবার জন্য ওপেন। যিনি চাইবেন তিনি পাবেন। যিনি চাইবেন তাকে সাধন পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। সাধন পথে দরকার শুধু মন। সাধন পথ ধরে যখনই কেউ এগিয়ে যাবেন তখন ক্রমান্বয়ে তার মধ্যে ভগবানের আংশিক জ্ঞান ফুটে উঠবে। ভগবানের প্রকাশ তিনি বারংবার বিভিন্নভাবে অনুভব করতে পারবেন। এইভাবে আংশিক জ্ঞানগুলোই সাধককে একসময় পূর্ণ জ্ঞানের দোরগোড়ায় নিয়ে যাবে যখন তিনি ভগবানের প্রকাশকে আরো বেশিমাত্রায় প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। যে প্রাণ একসময় ছিল ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞাত, তারপর হল সন্দিগ্ধ, সেই ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠল ভগবান সম্পর্কে অবগত। কোথায় খুঁজে পেল সে ভগবানকে, খুঁজে পেল নিজেরই মাঝে, যে ছিল এতকাল অনাবিষ্কৃত, অপ্রকাশিত; সেই হল আবিষ্কৃত, প্রকাশিত। তিনি সব প্রাণের মাঝেই আছেন তাই সবাই আছে সেই পোটেনশিয়াল ও সুযোগ তাকে উপলব্ধি করার। আমাদের ঋষি সমাজ এসেছেন জগৎকে এই মহাজ্ঞান দিতে, তারা উজাড় করে দিয়েছেন তাদের সাধনলব্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার সমাজের সকলের জন্য। তারা কোন পেটেন্ট দাবি করেননি। তারা নিজেরা অমৃত পান করেছেন ভগবানকে জেনে, আরো দশজনকে সেই অমৃতের সন্ধান দিয়ে গেছেন—এসো তোমরাও পান কর। ভারতীয় ঋষিরা কখনোই পার্থিব, দৃশ্যমান বস্তু বা জগৎ এ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে চাননি। তারা সব সময়ই জানতে চেয়েছেন অনন্তকে। তাদের কখনোই মনে হয়নি তারা মহান, বৃহৎ ও পরাক্রমশালী, বরং তারা এই সৃষ্টির পেছনে কেউ আছেন তারই সন্ধান করেছেন। এর ফলে তাদের মধ্যে এসেছিল বিনম্রভাব যেখানে নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞানে সৃষ্টির পেছনে ঐ বৃহৎ এর কাছে করেছিল সমর্পণ। এই সমর্পণেই তাদের কাছে সুযোগ মেলে বৃহৎকে জানার। শূন্য থেকেই শুরু হয় অনন্তের যাত্রা। নিজেকে বৃহৎ এর কাছে শূন্য করে দিয়েই অনন্তকে জানার দরজা খুলে যায় তাদের কাছে। তাই শূন্যের আবিষ্কার একমাত্র ভারতীয় ঋষিরাই করতে পেরেছিলেন। অন্যান্য সভ্যতা যেমন রোমান, চাইনিজ, মেসোপটিয়ান কেউ শূন্য সংখ্যার সন্ধান পায়নি, সবাই নিজেদের মত করে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত আবিষ্কার করে। একমাত্র ভারতীয় ঋষিরাই ০ থেকে ৯ সংখ্যা আবিষ্কার করে। এই ০ আবিষ্কারে পেছনে ছিল ভারতীয় ঋষিদের আধ্যাত্মিক চেতনা ও স্পৃহা। আধ্যাত্মিক চেতনা না থাকলে কখনোই ০ এর আবিষ্কার সম্ভব হবে না। কোন সংখ্যাকে যত ছোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় ভাগফল তত বড় হতে থাকে। সংখ্যাটিকে ১ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল সংখ্যাটির সমান হয় (যেমন ১০ ÷ ১০ =১, ১০ ÷ ৫ =২, ১০ ÷ ১ =১০)। এবার সংখ্যাটিকে ১ এর থেকেও ছোট সংখ্যা যথা ০ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় *** বা ইনফাইনাইট বা অনন্ত। ০ ই একমাত্র অনন্তের দরজা খুলে দিতে পারে। তাই ঋষিরা বল্লেন নিজেকে শূন্য কর, নিজের সব বাসনা ত্যাগ কর। নিজের আমিত্ব ঘুচাও, তবেই পাবে অনন্তের সন্ধান। যখন তুমি শূন্য হবে তখনই প্রকাশিত হবেন সেইপূর্ণ, সেই ভগবান যিনি ছিলেন তোমারই মাঝে আত্মারূপে। ভারতবর্ষকে বলা হত দেবভূমি। ভগবৎ জ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র ছিল এটি। যা কিছু সত্য ও শাশ্বত তাকে জানার প্রয়াসই ছিল জ্ঞান চর্চার মূল আধার। তাই সকল বিষয়েই ভারতবর্ষের মৌলিক অবদান ছিল; তা আকাশ-বিজ্ঞান হোক, চিকিৎসা-বিজ্ঞান হোক, গণিতশাস্ত্রে হোক কিংবা জ্যোতিষশাস্ত্রে হোক। প্রাচীন ভারত ছিল জ্ঞানচর্চার আধার। প্রাচীন চীন দেশে ভারতবর্ষকে ডাকা হত Tianzhu (তিয়ান ঝু) বা স্বর্গের কেন্দ্র। তিয়ান কথার অর্থ হল স্বর্গ এবং ঝু কথার অর্থ হল কেন্দ্র। প্রাচীন জাপানে ভারতবর্ষকে ডাকা হত Tenjiku (তেনজিকু) যার অর্থ হল স্বর্গীয় ভূমি। পৃথিবীর বুকে যদি এক টুকরো স্বর্গ থেকে থাকতো তা ছিল ভারতভূমি।

—ঃঃ—

স্বামী ভাস্করানন্দের সঙ্গে সিঙ্গাপুরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র

পার্থসারথি বসু

নেতাজীর মত মানুষরা যেন ব্রহ্মস্বরূপ। সিঙ্গাপুরে আজাদ-হিন্দ-বহিনীর যখন সদর দপ্তর তখন গভীর রাত্রে সবার অনায্য সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনে প্রায়ই যেতেন এবং পট্টবস্ত্র পরিধান করে দরজা বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন ভয়ঙ্কর সেই যুদ্ধের মধ্যেও। সিঙ্গাপুরের তৎকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দের সাথে ছিল নেতাজীর গভীর সখ্যতা। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে খাওয়ার পর নিজের গাড়ী পাঠিয়ে স্বামী ভাস্করানন্দকে নিজের বাসায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ আধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন হতেন, সেই সময় সিঙ্গাপুরকে বলা হত 'শোনান'। স্বামী ভাস্করানন্দ উদ্বোধনের ৫১ তম বর্ষে এই সম্বন্ধে পর পর দুটি প্রবন্ধ লেখেন যা থেকে প্রমাণ হয় নেতাজীর সাথে রামকৃষ্ণ মিশনের ছিল গভীর আত্মীক সম্পর্ক এবং নেতাজীর নিরবিচ্ছিন্ন সাধনার জ্বলন্ত ঐতিহাসিক প্রামাণিক তথ্য।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর আগমন বার্তায় সেখানে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এবার শুনবো রামকৃষ্ণ মিশনের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতি প্রতিজ্ঞানের একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর লিখিত প্রবন্ধের বিবরণ।

স্বামী ভাস্করানন্দ লিখেছেন, "কয়েকমাস পরে শুনিতে পাইলাম সুভাষবাবু টোকিয়োতে আসিয়াছেন এবং তথা হইতে শীঘ্রই রেডিওতে তিনদিন তিনটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম মোটামুটি এই ঃ—"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অমূল্য সুযোগ মিলিয়াছে। এই সুযোগ হারাইলে বহু বৎসর আর এইরূপ সুযোগ মিলিবার সম্ভাবনা নাই। এক অভাবনীয় উপায়ে আমার এদেশে আসা সম্ভবপর হইয়াছে। বৃটিশরাজ যেমন আমার ভারতের বহির্গমন বন্ধ করিতে পারে নাই। তেমনি আবার ভারতের অন্তর্গমনও বন্ধ করিতে পারিবে না। আপনারা জানেন আমি একজন বিপ্লবী (Revolutionist) । আপনারা জানেন যে আমেরিকার সাহায্য লইয়া ডি ভেলেরা আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন, আমাদেরও ঐ রূপ বড় স্বাধীন রাজ্যের সহায়তা মিলিয়াছে, জাপান আধুনিক জগতে এক পরাক্রমশালী জাতি, আমরাও তাহাদের সাহায্য লইয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইব। আমি আশাকরি ইহাতে আপনারা আমার সহায়ক হইবেন। আমি শীঘ্রই শোনানে (সিঙ্গাপুর) যাইতেছি।"

সাতদিনের মধ্যে তিনি বিমানযোগে শোনানে আসিলেন। শহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "ক্যাথে" নামক সিনামা হলে তাহার অভ্যর্থনার আয়োজন হইল। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন জার্মানী প্রবাসী ভারতীয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাসবিহারীবাবু সুভাষচন্দ্রবাবুকে লইয়া বক্তৃতা মঞ্চে উপস্থিত হইলেন। বিপুল জনতার সামনে রাসবিহারীবাবু বলিলেন, 'Here is your beloved lader Subhas Babu. I hand him over to you. From today onward he will be your Supreme Commender. I am too old now, let me retire. He will take you on to the path of freedom of India-our motherland . I hope you will follow him implicity as your destained leader." এরপর সুভাষবাবু তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলিয়া সভার কার্য শেষ করিলেন।

সুভাষবাবু জানায় আগমনের বার্তা বিদ্যুৎ বেগে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। যাঁহারা সুভাষবাবুকে পূর্বে ভারতে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন, আর যাঁহারা টোকিয়ো-রেডিওয়েতে তাঁহার ভাষণ শুনিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন যে তিনি জাপানী তৈয়ারী সুভাষবাবু তাঁহাকেও ক্রমশঃ তাঁহার কার্যকলাপ দেখিয়া ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে বিশ্বস্ত সূত্রে সব জানিয়া আর তাঁহার সম্বন্ধে সন্দিহান না সারাদিন কর্মব্যস্ত তার কাটিয়া যাইত। কার্যভার গ্রহণ করিবার কিছুদিন পরেই তিনি সর্ব্বসাধারণকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক বিরাট সভা আহ্বান করিলেন, শোনানের মিউনিসিপাল অফিসের সম্মুখে সুবৃহৎ ময়দানে এক জন সমুদ্রের মধ্যে তিনি তাঁহার জানায় আসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিলেন, বক্তৃতার প্রারম্ভেই মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেথাকে, আশ্চর্য এই যে ইহাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া জনতাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন, জনতার কেহই বারিপাতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিল। দেখা গেল বক্তৃতার শেষে সকলেই আর্দ্রচক্ষে অথচ শান্তচিত্ত গৃহে ফিরিয়া গেল। কথা প্রসঙ্গে কখন কখন সুভাষবাবু এই সভার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "দেখলেন সেদিন সভাতে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়া সত্বেও সবাই কেমন অবিচলিত চিত্তে বক্তৃতা শুনছিল, এতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে আমাদের কাজের জন্য সাধারণের সহানুভূতি অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে, এতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

স্বামী ভাস্করানন্দের বিবরণে দেখা যায় সুভাষচন্দ্রের দর্শনে এবং তাঁর ভাষণে দক্ষিণপর্ব এশিয়ার ভারতবাসী যেন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের কাছে সুভাষচন্দ্র যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসব এক দেবদূত।

স্বামী ভাস্করানন্দজী আরও লিখেছেন, '১৯৪৩ সনের বিজয়াদশমী রাত্রিতে সুভাষবাবু তাঁহার বাসভবনে হইতে সিঙ্গাপুর Indian Independence League-এর মারফত গাড়ী পাঠাইয়া আমাকে তাঁহার সঙ্গে অনতিবিলম্বে দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন রাত্রি ৯ টা হইবে। গাড়ী বাড়ীর দরজায় পৌঁছিতেই সশস্ত্র প্রহরীরা অতি করাইয়া দিল। সেক্রেটারী মিষ্টার হাসান্ আমাকে

উপরে সুভাষবাবুর নিকট লইয়া গেলেন, পৌঁছিবা মাত্রই তিনি অতি বিনীত ও শ্রদ্ধাবনত হইয়া প্রণাম করিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন এবং সহকারীদের চা আনিতে আদেশ দিলেন। ইত্যবসরে কথা চলিতে লাগিল। তিনি আমাদের সিঙ্গাপুর আশ্রমের কাজকর্ম সম্বন্ধে জানিতে উৎসুক হওয়ায় আমি তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বলিলাম, পরে চা পান শেষ হইলে আবার কথার্বাতা আরম্ভ হইল।

কথা প্রসঙ্গে তাঁহার কলিকাতা হইতে বাহির হইবার পূর্বাবস্থা বলিলেন, "জেল হইতে বেরিয়ে আমি যখন আমাদের Elgin Road- এর বাড়ীতে বাস করছি তখন কি যেন একটা দৈবশক্তি-প্রণোদিত হয়ে ঐ বাড়ী হতে বেরোবার এবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার জন্মেছিল। সব সময়েই মনে হত এবার বেরিয়ে পড়ে কিছু একটা করা যাক। যা কিছু করবার এই সময়েই কর্ত্তে হবে। কি হবে এভাবে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে থেকে? বন্ধুদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করা গেল। শীঘ্রই একটা উপায় বের করে ফেললাম। আমার ঘরে সকলের প্রবেশ নিষেধ করে ছিলুম। চণ্ডী, গীতা ইত্যাদি পাঠ করি দেখি ও আমার নিষেধ শুনে কেউ আর কাছে আসত না। এই সুযোগ আমি বেড়িয়ে পড়লুম। দেখলুম আমার বন্ধুরা Carried out their duties. সেইজন্যই আমার এখানে আসা সম্ভব হয়েছে।

নেতাজী সুভাষ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী ভাস্করানন্দ মহারাজের কাছে প্রাণখুলে তাঁর ঐতিহাসিক বিপদজনক যাত্রার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অতি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভাস্করানন্দ মহারাজের কাছে সুভাষচন্দ্র স্পষ্টই বলেছেন "দৈব-শক্তি-প্রণোদিত" হয়ে তিনি মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে দেশ ছাড়বার পরিকল্পনা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র সারাক্ষণ তাঁর বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যেও যোগ সাধনা করে নিয়েছেন সবার অন্তরালে। আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারাই তিনি পরিচালিত হয়েছেন।

স্বামী ভাস্করানন্দ লিখেছেন, "কলিকাতা হইতে কিরূপে জার্মানীতে গেলেন ও তথা হইতে কিরূপেই বা জাপানে আসিলেন তৎসম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে তিনি কোন স্পষ্ট উত্তর না দিয়া বলিলেন, "এ সম্বন্ধে বরং এখন কিছু না বলাই ভাল।" আমরা কিন্তু কিছুদিন পর জানিতে পারিলাম কলিকাতা হইতে মটরে চড়িয়া কিছুদূর যাইয়া ট্রেনে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পার হইয়া আফগানিস্থানে যান। তথা হইতে ইটালী হইয়া জার্মানীতে পৌঁছান। (একটু ভুলতথ্য-নেতাজী আফগানিস্থান থেকে মস্কো, মস্কো থেকে জার্মানি যান— লেখক) । রাশিয়াতে যাবার সংকল্প করিলেও তখন আর হইয়া উঠে নাই।

রাসবিহারীর প্রস্তাবে জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংবাদ-বিনিয়ম করিলেন। জার্মান কর্তৃপক্ষ জানাইলেন যে জাপান সরকার সুভাষবাবুকে জাপানে যাইবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। আরও বলিলেন, You are at liberty to go to Japan at your own risk. The road is full of dangers. We cannot stand guarantee for your life. We shall advice not to go." জাপান যাইবার পূর্ণ স্বাধীনতাই আপনার আছে। কিন্তু আপনার জীবন বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে, সমস্ত রাস্তাই অতিশয় বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি আপনার না যাওয়াই ভাল। সুভাষবাবু উত্তরে জানাইলেন, " I am ready to risk my life if it is sacrificed at the alter of the freedom of my Motherland. I must go."

আমি আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি নিশ্চয়ই যাইব- জার্মান সরকার তদানুযায়ী ডুবরী জাহাজে (Submarine) তাহাকে ভূমধ্যসাগর অবধি পৌঁছাইয়া দেয় এবং পিনাং হইতে জাপানী ডুবরী জাহাজ ভূমধ্যসাগর হইয়া তাহাকে লইয়া শোনানে (সিঙ্গাপুর) আসে। তিনি বিমান যোগে শোনানে আসেন। তিনি বিমান যোগে শোনান হইতে টোকিয়োতে যান। এ খবর পূর্বে শোনানীগণ (সিঙ্গাপুর) কেহই পূর্বে জানিত না,

অতঃপর তাঁহার কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, "জগতের ইতিহাসে কোন পরাধীন জাতিই অন্য কোন প্রতাপশালী স্বাধীন জাতির সাহায্য না নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর হতে পারে নাই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আমরাও চাই ঐরূপ একটি সাহায্য। জাপান জগতের মধ্যে একটা গণ্যমান্য জাতি হয়ে উঠেছে। তার প্রতাপ আমরা সচক্ষে দেখেছি। ঘটনাপরম্পরায় জাপানের সাহায্যও পাওয়া সুগম হয়ে উঠেছে। এই সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দিলে আগামী একশ বছরেও এই সুযোগ মিলবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং আমি ঠিক করেছি জাপানের সাহায্য নিয়ে যথাশক্তি সংগ্রাম চালিয়া ভারতকে ইংরেজাধিকার হতে মুক্ত হতে চেষ্টা করব। গীতায়ও ত বলেছে আমাদের কাজে অধিকার ফলে নয়, কাজ ত করে যাই ফল তাঁর হাতে।"

আমি পুনরায় জিজ্ঞাস করিলাম, "আপনি কি মনে করেন জাপানীরা প্রতিশ্রুতিমত কাজ করিবে? যদি তাহা না করে কিংবা জাপানীরা আপনার সাহায্যে ভারতাধিকার করিবে এইরূপ কোন দুরভিসন্ধির বশবর্তী হয়ে আপনাকে বঞ্চনা করে তা হলে কি করবেন"? উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি যতদূর বুঝেছি এইরূপ কিছু হবার সম্ভবনা নেই। কারণ মোটামুটিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের করতে হবে। এদেশের ভারতীয়দের অর্থে পরিচালিত সৈনদের দিয়েই সমস্ত কাজ চলবে। কেবলমাত্র হাতিয়ার জাপানীদের থেকে নিতে হবে। আমাদের ফৌজ অনেক পরিমাণে জাপানীদের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হবে, আমার মনে হয় জাপানীরা অতটা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কোন প্রকারে বাঙ্গালদেশে প্রবেশ করতে পারলেই আমাদের চিন্তা থাকবে না, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে বাঙ্গলায় পৌছুবামাত্রই আশাতীত সাহায্য আমরা সকলের কাছ থেকেই পাব। আমার খুবই ভরসা আছে যে

আমার দেশবাসীই আমার এই কাজে সহায়ক হবেন। জাপানীদের প্রতি শ্রুতিভঙ্গের প্রতিক্রিয়ার জন্যও আমাদের তৈরী থাকতে হবে।"

এইরূপ কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আম বললাম, "আমাদের মিশনের কার্য্যর ধারা আপনারা যে কিছুই অজ্ঞাত নাই, আমরাও মিশনের উদ্দেশ্য ও আদেশ বজায় রাখিয়া যতটা পারি আপনার কাজে সহায়তা করিব, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবেন।"অনুরূপ হইয়া নৈশ আহার সমাপনানন্ত্রে আশ্রমে ফিরিতে রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল, তাহার সহিত দেখা করিতে গেলেই তিনি কখনও ভোজন না করাইয়া ছাড়িতেন না, তাহার আদর আপ্যায়নে সত্য সত্যই কেহই মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না।"

বিশ্বযুদ্ধের এই সঙ্কটময় সময়েও এবং চরম অনিশ্চতময় জীবনের মধ্যে নেতাজী শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশনের মত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি ঐ সঙ্কটময় মুহূর্তেও মিশনের সেবামূলক কাজে বিপুল আর্থিক সাহায্য করেন। ঠাকুর-মা-স্বামীজী ছিলেন তাঁর পথপ্রদর্শক। তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে অবস্থান কালও তাই মাঝে মাঝেই বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটারমধ্যেও স্বামী ভাস্করানন্দ মহারাজ সহ মিশনের মহারাজাদের ডেকে নিয়ে গভীর আধ্যাত্মিক আলোচনায় নিমগ্ন থাকতেন।

জার্মানীতে থাকাকালীন নেতাজীর কোন আধ্যাত্মিক সাধনার বিবরণ না পেলেও তিনি যে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ৯০ দিনের ভয়ঙ্কর ডুবোজাহাজ যাত্রায় তাঁর অকুতভয় প্রমাণ করে সাধন জীবনের কি বিপুল উচ্চসনে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

—ঃ—

শ্রী অনির্বাণ প্রসঙ্গে

আশুরঞ্জন দেবনাথ

অনির্বাণের শ্রীঅরবিন্দ অনুরাগে মুগ্ধ শ্রীদীলিপ কুমার রায় তাঁর স্মৃতি চারণ গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

অনির্বাণ যে শ্রীঅরবিন্দের মহাবাণীর মর্ম গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তা ভাবতে আমি গভীর আনন্দ পেয়ে এসেছি। ইচ্ছা আছে, ভবিষ্যতে এ-দুই অসামান্য মহাযোগীর দৃষ্টিভঙ্গির নিবিড় আত্মীয়তা সম্বন্ধে আমার যা মনে হয়েছে বলব। কিন্তু উপস্থিত অনির্বানের প্রসঙ্গে ফিরে আসার আগে এ-প্রসঙ্গে একটা কথা বলিঃ শ্রীঅরবিন্দের দেহরক্ষার পরে আমার মনে যেসব প্রশ্ন উদয় হত তাদের কোনো সমাধান পাইনি আনির্বাণের নানা পত্র পড়বার আগে। তাঁর চিন্তার ভঙ্গী আমাকে সত্যিই চম্‌কে দিত—(১০)

যে নিবিড় আত্মীয়তার কথা সম্ভবত আর বলা হয়নি।

*** *** ***

শ্রীগোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর মহাজন সংবাদ " গ্রন্থে শ্রীঅনির্বাণ স্মৃতিচারণায় লিখেছেন ঃ

শ্রীমৎ অনির্বাণ শ্রীঅরবিন্দের এত অনুরাগী হয়েছিলেন এবং কোনও পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর জীবন দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যে মহাগ্রন্থের মধ্যে, সেই Life Divine -এর বঙ্গানুবাদে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, তার একটিমাত্র কারণঃ দুজনেরই উপলব্ধি ও অনুভূতির সমগোত্রীয়তা।

শ্রীমৎ অনির্বাণ এবং শ্রীঅরবিন্দ দু'জনেই দিব্য রূপান্তরবাদী। দু'জনেই মূলত বেদবাদী, যত না বেদান্তবাদী। বেদের সংহিতা ভাগের সমস্ত মন্ত্রে 'একং বা ইদং বিবভূব সর্বম্" সেই একই যে এই সব হয়েছেন, তারই বর্ণনা। নানা নামে সেই এক সৎ স্বরূপের বর্ণনা, 'একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। তাই এক থেকে বহুর এই প্রসারণের মহাকাব্যের দিকে ঋষি-কবির দৃষ্টি, সবাইকে ডাক দিয়েছেন দেখতে দু চোখ মেলে; 'পশ্য দেবস্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি,' দেখো দেখো দেবতার, সেই দ্যুতিমান, দীপ্তিমানের আলো ঝলমল এই কাব্য, যা কখনো মরে না, কখনো জরে বা বা জীর্ণও হয় না। সেই কবে থেকে সূর্য উঠছে, চন্দ্র তার শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে আবর্তিত হচ্ছে, সমুদ্রে, নদীতে জোয়ারভাটা খেলছে, ঋতু চক্রের আবর্তনে একবার গ্রীষ্ম, আবার শীত আসছে, বর্ষায় মেঘের ঘন ঘটায় আকাশের মুখ কালো হচ্ছে, আবার শরতে আলোয় হেসে উঠছে, মানুষের দিকে তাকিয়েও দেখো কখনো হাসিতে উচ্ছল কখনো বা অশ্রুসজল! এই তো জরামরণহীন চিরন্তন কাব্য সেই দেবতার, দেখো না দুচোখ ভ'রে। অনির্বাণ একেই নাম দিয়েছেন চিন্ময় প্রত্যক্ষবাদ বলে', যা বেদের মধ্যে উদ্‌গীত, বিধৃত হয়ে আছে। শ্রীঅরবিন্দও যেমন বেদের অতলান্ত রহস্য-সাগরে ডুব দিতে গিয়ে তার ব্যাখ্যাতেই প্রধানত আত্মনিয়োগ করেছেন এবং বিশেষত তার অগ্নিসূক্তগুলির অনুবাদে ও ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত থেকেছেন, শ্রীমৎ অনির্বাণও 'বেদ-মীমাংসা' গ্রন্থের তিনটি খণ্ডে এই বেদরহস্য উন্মোচনেই জীবন উৎসর্গ করেছেন। 'উপনিষৎ প্রসঙ্গ' 'গীতানুবচন' এসবও তিনি লিখেছেন কিন্তু সবই বৈদিক জীবনদর্শনের আলোকে, যেমন শ্রীঅরবিন্দও লিখেছেন 'Essays on the Gita বা Isha upanishad প্রভৃতি। কিন্তু বেদই হ'ল দুজনেরই প্রাণ, প্রেরণার মূল উৎস।

শ্রীমৎ অনির্বাণের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ভাবনার ঐক্যের দ্বিতীয় অন্য একটি মূল হ'ল উভয়েরই সমন্বয়ী সৃষ্টি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শনের সমস্ত ভিত্তি স্থাপন করেছেন, উৎস খুঁজে পেয়েছেন একটিমাত্র ক্ষুদ্র আকারের উপনিষদে, যারনাম ঈশোপনিষদ। সেই উপনিষদটির মূল সুরটি হ'ল সমন্বয়, 'উভয়ং সহ'। বিদ্যা-অবিদ্যা, সম্ভূতি অসম্ভূতি এসব পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব নয়, দুয়েরই সার্থকতা

আছে এবং তাই দুইকে মিলিয়ে চলার মধ্যেই, সমন্বিত করার মধ্যেই সাধনার চরিতার্থতা। শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের বীজ লুকিয়ে আছে যেন সম্পূটিত আকারে এই আঠারোটি মাত্র 'মন্ত্রের স্বল্পপরিসর উপনিষদটির মধ্যে। এটিও লক্ষ্য করার বিষয় যে এই ছোট উপনিষদটি শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত। যে যজুর্বেদ মূলতঃ কমর্বেদ এবং তাই কর্মকে প্রত্যাখ্যান ক'রে জগতে স্থিতির পক্ষপাতী নয়। কর্মকে শুক্ল বা ভাস্বর ক'রে জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করতে, সমন্বিত করতে চেয়েছে তাই এই উপনিষদ।

[**সম্পাদকের সংযোজন ঃ** কৃষ্ণ যজুর্বেদকে কর্মবেদ বলে আখ্যা দেওয়ার কোনও ভিত্তি নেই। কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত কঠ উপনিষদ। এটি পরিপূর্ণ আত্মতত্ত্বের বিস্তৃত বর্ণনায়। কঠ উপনিষদে নচীকেতাকে যম শিক্ষা দিয়েছেন পূর্ণত্বের। পরমাত্মাই ঐ পূর্ণ। আবার হৃৎ গুহায় নিহিত আত্মারূপী হয়ে পরব্রহ্ম সনাতনই বিরাজ করছেন। জীবন ক্ষেত্রে সাধন শ্রেয় ও প্রেয় বিচার করবেন। সর্বদাই তিনি ব্রহ্মভাবে নিহিত হয়ে থাকবেন। এটি সচ্চিদানন্দের জগৎ প্রকাশ।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের আর একটি প্রধান উপনিষদ শ্বেতাশ্বতর। যারা বেদ সম্পর্কে সঠিক ওয়াকিবহালর প্রত্যক্ষভাবে, তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন পরম তত্ত্ব-পরব্রহ্ম সনাতনকে সার্বিক জ্ঞানে জানতে একা শ্বেতাশ্বতরই সম্পূর্ণ। এজন্যই ঋষি প্রত্যয়স্নাত দৃষ্টিতে আহ্বান জানিয়েছেন ঃ 'শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।'

ঋষি বুঝলেন ব্রহ্মলাভ সম্পূর্ণ হয় পূর্ণ নিবেদনে। 'ন তস্যরোগঃ ন জরা ন মৃত্যুঃ। প্রাপ্তস্য যোগ অগ্নিময়ম্ শরীরম্।' এটি ফলিত অবস্থা, ইচ্ছা মৃত্যু। স্বামী বিবেকানন্দ এই যোগাগ্নিময় শরীরে অবস্থানের পর ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন। কৃষ্ণ যজুর্বেদ সার্বিক সর্বময় এক ব্রহ্ম, আপাত পরিচয়ে বহুতে ব্যাপ্ত হয়ে বিরাজমান এই সৃষ্টিকে সামগ্রিক ব্রহ্মময় বলেছেন। 'যঃ দেবঃ অগ্নৌ যঃ অপ্সুঃ। যঃ বিশ্বম ভুবনম্ আবিবেশ। যঃ ঔষধীষু যঃ বনষ্পতিষু। তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।' শ্রী অরবিন্দ এই 'যোগাগ্নিময়ম শরীরম'—আর 'বিশ্বাত্মম' সাধন দেখিয়েছেন অশ্বপতির যোগের মধ্য দিয়ে। পরিণতিতে সাবিত্রী ঐ সার্বিক 'cosmic revelation of supreme'কে জীবনের অঙ্গে অঙ্গে নিয়েছেন — যা কৃষ্ণ যজুর্বেদ সহ সব ক'টি বেদ প্রজ্ঞায় নিহিত।।]

শ্রীমৎ অনির্বাণও উজিয়ে যেতে চা'ন সেই মূলে, হিমগিরি শিখরে কিন্তু আবার ভাটিয়ে নেমে আসতে চা'ন সেই হরজটাজাল-নিঃসৃত গঙ্গার পাবনী ধারায় ভগীরথের সগরবংশোদ্ভূত পূর্বপুরুষদের পুনরুজ্জীবিত করতে। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার অনন্তকালের প্রতীক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন এই দুটি ঃ হিমালয় ও গঙ্গা। একটি যেন কূটস্থ নিত্যের পরিচায়ক, 'অচলং ধ্রুবং' হয়ে বিরাজমান অটল আপন স্থিতিতে। আর অন্যটি পরিণামি নিত্যের সদা প্রবহমান ধারার যেন জ্ঞাপক। এ ধারা একবার উপরে উঠছে, মূলকে ছুঁয়ে আবার নেমে আসছে, ধেয়ে চলেছে সাগর পানে। এই আরোহ অবরোহকেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শনে চিহ্নিত করেছেন Ascent ও Descent নামে। একটা আস্পৃহা, Aspiration -এর আগ্রহের ঊর্ধ্বায়িত অগ্নিশিখা যেন , আর অন্যটি অনুগ্রহের স্নিগ্ধ সৌম্য ধারা, যা নীচের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে উপর থেকে যেন নেমে আসে।

মহাজনদের মধ্যে অনেকে হিমগিরির উত্তুঙ্গ শিখরেই নিত্য নিবাসী হয়ে থাকতে চান, কেউ বা গঙ্গোত্রী থেকে সেই উৎসমুখের বিশুদ্ধ মন্দাকিনীধারা আপন কমণ্ডলুতে সংগ্রহ ক'রে আবার নেমে আসেন রামেশ্বরের শিয়রে অর্পণ করবেন ব'লে, সেই অভিষেকেই কৃতার্থ হবেন ভেবে। এ হ'ল ভাবনার তারতম্য। কেউ সত্যের মধ্যে নিত্য স্থিতি চা'ন, কেউ আনন্দের উচ্ছলনে ভেসে চলেন। শ্রীঅরবিন্দ আনন্দময়ীকেই সব চেয়ে মাথায় ক'রে রাখেন, তারপর নেমে আসেন চৈতন্যময়ী ও সত্যময়ী পরমের মধ্যে। শ্রীমৎ অনির্বাণও সেই পথের পথিক। আনন্দ বিরহিত কেবল সত্যের তাঁরা কেউই উপাসক ন'ন।

তাই শ্রীমৎ অনির্বাণ ও শ্রীঅরবিন্দ এঁদের দু'জনেরই আশ্রয় হ'লেন শক্তি, যার অপর নাম হ্লাদিনী বা আনন্দময়ী। এই হ'ল তাঁদের উভয়ের ভাব সমন্বয়ের তৃতীয় নিদর্শন। শ্রীমৎ অনির্বাণের চিরদিনের আশ্রয় ও আরাধ্যা ছিলেন হৈমবতী, আর শ্রীঅরবিন্দর সাধনার সিদ্ধিদাত্রী রূপকর্ত্রী ছিলেন শ্রীমা, যাঁর স্বরূপের চারটি বিভাবের মহিমা The Mother নামক একটি ছোট গ্রন্থে অপরূপভাবে উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন তিনি" (১১)

*** *** ***

শ্রীগোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর মহাজন সংবাদে আরও বলেছেন, "শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীমৎ অনির্বাণ সকলরই সৃষ্টির প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টি। তাঁরা চান 'আবিরাবীর্ম এধি,' আরও আবির্ভাব আরও প্রকাশ। সৃষ্টি তাঁর যখন আত্মপ্রকাশ, তখন তার পরিপূর্ণ প্রকাশ হবে না কেন এখানে, এই ধুলার ধরণীতে মাটির পৃথিবীতে? সৃষ্টি মানুষেই থেমে থাকবে কেন। সে কেন সৃষ্টি করবে না অতিমানব কে? মানস থেকে উর্ধ্বমানস আলোকিত মানস, অধিমানস, ইত্যাদি ক্রমে অতিমানসে কেন পৌঁছবে না মহাকবিকাশ? শ্রীঅরবিন্দ তাঁরই স্বপ্ন দেখেছেন। তেমনি শ্রীমৎ অনির্বাণ ও বৈদিক ঋষির আলোক-বন্দনার ধারায় সূর্যের ক্রমিক প্রকাশকে সপ্তপদী আরোহণের মধ্য দিয়ে অশ্বী-উষা-সবিতা-ভগ-সূর্য-পূষা-বিষ্ণু এই ক্রমে মধ্যগগণের দেদীপ্যমান বিশ্বব্যাপ্তিকরণ মহাপ্রকাশে নিয়ে যেতে চাইছেন। বৈদিক ঋষিরা জানতেন বিষ্ণুর পরম পদেই আছে 'মধ্ব উৎস', মধুর উৎসস্থল। সেই তো রাসস্থলী, আনন্দ-বৃন্দাবন বা মধু বৃন্দাবন। আর সূর্যমণ্ডল ভেদ করে সেখানে পৌঁছতে পারেন এবং সেখান থেকে সেই সোম বা আনন্দের অমৃত আহরণ করে আনতে পারেন একমাত্র গায়ত্রী বা সাবিত্রী। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অসাধারণ প্রতীকী মহাকাব্য সাবিত্রীতে সেই মহাশক্তিরই স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, যিনি একমাত্র পারেন মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে সত্যবানকে ছিনিয়ে আনতে।" (১২)

*** *** ***

একবার শ্রীগোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় শ্রীঅনির্বাণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ

"অধ্যাত্মসাধনার চরম কথা সবই তো বলা হয়ে গিয়েছে বেদ-উপনিষদে, শ্রীঅরবিন্দ আর নতুন কি বলছেন? শ্রীঅনির্বাণ একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন ঃ হ্যাঁ, পুরুষ বা আত্মার দিক দিয়ে সাধনায় শেষ উপলব্ধি ঘটে গিয়েছে, অবশ্যই বলা যায় কিন্তু প্রকৃতির দিক দিয়ে সাধনা এখনও যেন শেষ হয়নি। শ্রীঅরবিন্দ সেই দিকের কথাই বলছেন, জীবনকে দিব্য করা প্রকৃতির বিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে।" (১৩)

*** *** ***

শ্রী অশোককুমার রায়তার 'কথাপ্রসঙ্গে শ্রীঅনির্বাণ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

৫ই জানুয়ারী ১৯৭৭। শ্রীঅনির্বাণ বললেন, দেখ, ইতিহাস বলতে 'ইতি + হ + আস'—এইরকম ভাবধারা বর্তমান ছিল, সাধারণত আমরা এই বুঝি। কিন্তু ইতিহাসের বিচিত্র পতির মধ্যে পরমেশ্বরের দিব্য লীলাকে প্রত্যক্ষ করতে করতে আমার কি মনে হয় জান?—ইতিহাস—ইহা দেখ এবং হাস—এইটুকুর মধ্যেই জীবনের গভীরতম সত্য এবং আনন্দ নিহিত। বাইরে যা ঘটে তা ভিতরেরই প্রতিভাসমাত্র। অন্তর্জগতে বিপ্লব তোলপা করে, পরে সেটির প্রতিফলন ঘটে বহির্জগতে।

শ্রী অরবিন্দের মহাপ্রয়াণ মুহূর্তে, আমি তখন দিল্লিতে, রাত্রি ১-১৫ মিনিট, আমার একটা অদ্ভুত জ্যোতিদর্শন হয়েছিল। (১৪)

*** *** ***

পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রম নিবাসী-এক ভক্তকে ২৯-৪-৫৪ তারিখের এক চিঠিতে শ্রীঅনির্বাণ লিখেছেন,

আচ্ছা, আমি এক কাজ করব। শনিবার দিন তো আলোচনা করে আসব, আর রবিবার দিন তোমায় চিঠি লিখব। সেদিন আলোচনার সারটুকু তোমার সহজ করে অল্পের মধ্যে লিখে পাঠাব। বেশী লেখার তো সময় হবে না, শ্রীঅরবিন্দের ভাবনার মূল সূত্রগুলি তোমায় ধরিয়ে দব। তাহলে হবে তো?

শ্রীঅরবিন্দের আসল কথাটা হল, সহজ হওয়া, বিরাটকে তোমার দেহ-প্রাণ-মন সব কিছু দিয়ে অনুভব করা। সূর্যের আলোয় যেমন সহজে ফুল ফোটে, ফুলের অন্তরে-বাইরে সেই আলোর স্পর্শ তাকে প্রতি মুহূর্তে সুন্দর-সুরভি ও সুকুমার করে তোলে, সূর্যের শুভ্রতাকেই সে বিচিত্রবর্ণে বিচ্ছুরিত করে, তেমনি করে জীবনকে তাঁর পানে মেলে ধরা তাঁর হয়ে, তাঁর আলো, আনন্দ আর শক্তিক বিকিরণ করা প্রতি কর্মে, প্রতি বাক্যে, প্রতি চিন্তায়—এই হল দিব্যজীবন।...

সূর্য আর ফুলের এই সহজ সম্পর্কটি সূর্যের দিক দিয়ে হল descent বা অবতরণ, আর ফুলের দিক দিয়ে হল aspiration বা অভীপ্সা, আকুতি। ফুল ফোটা যখন শেষ হবে, তখন ঐ descent আর aspiration একাকার হয়ে যাবে, তখন আর চাওয়া-পাওয়া থাকবে না। জীবনটা হবে সহজের সুষমা। (১৫)

অরবিন্দ দর্শন দিব্যজীবন বলতে কী বোঝান হয়েছে অতি সংক্ষেপে তার এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বোধ হয় শ্রীমৎ অনির্বাণ ভিন্ন অন্যের লেখনীতে সম্ভব নয়।

শ্রীঅরবিন্দের যোগসমন্বয়ের লক্ষণ সম্পর্কে পণ্ডিচেরির ভক্তটিকে তিনি লিখেছিলেন (৩.৬.৫৬)—'দেহ মন আর আত্মা—এই তিন নিয়ে মানুষ। দেহটা হল জীবনের বুনিয়াদ আর আত্মা হল তার চূড়া। মন হল দূরের মাঝে সেতু। দেহ জড়ধর্মী, মন চায় প্রগতি, আর আত্মা চায় আলো, শক্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, বৈপুল্য—এই সব দিব্যগুণ। মনের আর আত্মার সাধনাতে দেহ অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তার জড়ত্ব মনের গতিকে ব্যাহত করে, আত্মার সাধনাতে দেহ অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তার জড়ত্ব মনের গতিকে ব্যাহত করে, আত্মার আলোকে আবছা করে তোলে। কিন্তু এ বাধা আমাদের কাটিয়ে উঠতেই হবে, তারকটা দুর্দম প্রেরণা আমাদের মধ্যে আছেও।

বাধা কাটাতে গিয়ে আমরা সংসার থেকে ছিট্‌কে পড়ি। সেটা হয়তো কতকটা প্রয়োজনও। কিন্তু সেইটাই আমাদের চরম লক্ষ্য নয়। নিজের মাঝে আত্মার আলো আর মনের ঐশ্বর্য পেতে গিয়ে নিজেকে সবার থেকে সাময়িকভাবে আলাদা করে নিতে পারি, কিন্তু আমাদের দায় হবে, অন্তরে যা পেয়েছি তাকে বাইরের কর্মেও প্রকাশ করা এবং প্রকাশ করা সবার জন্যে। অন্তর্মুখীনতায় আমরা আমাদের মাঝে কোনো লুকানো যোগশক্তির পরিচয় পাই; সেই শক্তিকে সবার কল্যাণে প্রয়োগ করাতেই আমাদের সাধনার চরম সিদ্ধি। প্রকৃতিরও তাই উদ্দেশ্য। ইউরোপ মনকে বড় করেছে আমরা আত্মাকে বড় করেছি। এইবার সাধনার দুটি ধারাকে মেলাতে হবে। আত্মার সম্পদকে দেহে-প্রাণে-মনে প্রকাশ করতে হবে। এই হল যোগসমন্বয়ের লক্ষণ। (১৬)

—ঃঃ—

মা

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

যতদিন পাশে ছিলাম
বুঝিনি তোমার মহিমা
আস্থা অনাস্থার দোলায় সময় প্রবাহ
আজ ভিনদেশে যখন সমস্ত ওলটপালট
কম্পনের পরেও ভূগর্ভে আরও কম্পন
মাটির স্তরে স্তরে প্রাণনাশী স্পন্দন
ত্রস্ত মানুষ ছোটে এদিক ওদিক
তখন শঙ্কাময় জীবনে দেখি তোমার মূর্তি
সুরক্ষার হাত অভয়বাণী ভরসার ছায়া
সে ছায়া সন্ধ্যার আকাশে অরণ্য পাহাড়ে
পাশাপাশি হাঁটে আমাকে ঘিরে
আজ ঘরে ফিরছি নিশ্চিন্তে নিজস্ব সংসারে
সবই তোমার ছায়ায় তোমার কৃপায়
তোমারই স্নেহমায়ায় তোমারই ভরসায়।

—ঃঃ—

The Meditative Personality

—Prof. (Dr.) R. P. Banerjee

Meditative Power : Power of meditation may prevent situations of negative impacts and even meditations as a means can be applied to this context to rescue the person from the positions of the stressful and dull mind. Meditation infuses new energy into the system of the person and as such the person would be inclined to carry on further on a scale of regularity. This however makes it so vibrant a system that meditative mind is gradually developing the immune to its power of garnering mental energy towards applying that on the physical and mental system of that particular individual. The final impact of this is the basis of incomposite of things which may drive for success.

Meditation, as a practice, builds a personality to such a scale that the person becomes automatically sensitive to the ethical context of a state of thing. This ethical sensitivity thus makes the senses of the person awakened to the spirit of ethics such that in the context of any kind of work, thought, aspiration and the potent for doing anything, the person thinks, writes and talks ethical always in all situations.

A meditative mind dresses up to the condition of psychological safety of the person, such as the power of tolerance and the wealth of imagination Work demands the person to initiate new journey in life and works when that is called for. Psychological safety, when provided, the person enjoys the power of guidance and function as the guide and lead to many persons in a context of organization or of any distraction from the charted pathways. The meditative mind goes forward unto the winning position. Thus the mind that develops its power of autonomy, it inspires the person to become strongly fit to identify Leader within herself or himself. The person as such discovers the potential divinity and elemental consciousness within. It is thus the leader within takes over the role of a leader without.

The power of a meditative mind enhances many-fold. Meditation of the mind towards achieving the goal of awakening of the consciousness in a way and a manner that makes things happen in the right perspective to actually take out the positions of the empirical identities of the same. The understanding of mind in its normal, usual condition is a kind of empirical, material understanding. This has the limit of a horizon, which is material and surficial in nature and in most of the cases has been conditioned by the tangible, visible dimension of things together. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says to Arjuna:

Yatha aakashah sthitah nityam bayuh sarvatrago mahan
Tatha Sarvani Bhutant mat sthani iti upadhrayo (Gita 9/6)

(The transcendental form of god is revealed only through the realization of his cosmic form and revelations that would enhance the process of the journey of life. This is like the air which penetrates inside every living organisms and material objects as well. It can penetrate through each nano orifices of any living identities and the material objects in the earth system.)

The knowledge of this statement of the Lord is considered as what the entire universe is in some way the representation of the supreme on earth. It can be known from the statement for an intellectual knowledge and this knowledge and at the same time can connect with the thing of this view of the divine person, Lord Krishna. This knowledge to be imbibed in life whenever one comes to know about it. But the spiritual understanding of such element of knowledge begins only when the desirous person settles scores of things and tries to have the view of Lord realised. The process adopted in such realization is somewhat meditation by the person. Meditation demands certain set of restrictions to achieve certain factors. Preparatory precaution and set of controlling factors are also very essential to create the best out of the varied forces of the mind. Chitta-Manas-Buddhi-Prajnah- these are the four segments of the mind from spiritual perspective. Chitta is the seat bed of memory. When one tries to have the concentration, Chitta comes up gets automatically concentration of the mind. The waves of memories in the mind should be waved out in the same Chhanda of its origin. This is like centralizing a position with the similar ones in the context of human psycho-spiritual understanding and analysis in a particular context.

Inner consciousness settles the thing. Whenever things of the external identity are considered, it happens that the inner consciousness always banks on the state of unfoldment of the dormant truth within. If the dormant truth happens to be in the order of the vastness of the sky, it relates to the point of eternity that showers the inner mind with its fundamental tenets. Fundamental pattern of this universe is that the truth that stays within always sets motion to have its route towards the outer domain. In a way, it happens to be the only factual content of whatever external identity it develops at that point of time.

Satyam brihat ritam ugram.
Diksha tapoh Brahma yajnah. Prithivi dharayanti.
Sa noh bhutasya bhabyasya patni
Drum lokam prithivi nah krinotu. (A.V 12/1/1)

(The truth is vast and all-pervading. Truth in action is that eternal truth constrained by the space and time. Consecration, ascecis, sacrificial performance, all uphold the truth. The earth alone contains all these in her domain. May the mother earth make this place better and enduring and reveal truth in action and truth in movement to us always.)

Truth in eternity is the holistic truth This covers the truth of intrinsics on one hand and that of the intrinsic dimension and all dimensions whatsoever. The extrinsic dimension of truth is what we get in the world as a kind of visible, tangible ones. The external dimension usually comprises attention that covers aspects of measurable and quantifiable included. Measure that the relationship of each of the sensitive dimensions that are causes of the lives to continue in existence. The vital force of a person actually makes ways for the understanding, the impacts of the vibration of life and work. The intrinsic aspect of fife as such an elaboration of the dimensions, both extremes of life thus receives the graceful gift of god. Therefore total truth as such becomes such makes the realm of life stronger whatsoever.

Ta nah prajah sam duhatam samagra
Bacho madhu Prithtvi dhehi majhyam. (A.V 12/1/16)

(May everyone, all human beings, pray and offer blessings in harmony, oh the Mother Earth. You are the mother of all mothers. Endow me with your sweet and caring blessings.) Whenever realisation sets in a person, the entire personality, including the outlook, conviction, personal belief, quality of actions, focus of life and the character of the person gets transformed. The situation becomes such that the individual positioning in the world and the related dimensions of the individual person and the entire spectrum of things or the response level comes under such control that everyone and everything is taken into consideration and vitality. The person now discovers sweetness in everything that the world presents to.

Actually through meditation, connection with the lord is established. This sweetness has two proved impacts :

→ the impacts in the empirical level of consciousness

→ the impacts on the eternal consciousness and realisation.

The limits of ascendence has broken of all barriers of empirical identities and actual identity remains engrossed in that. It reflects through happiness enjoyed in work and activities, thus the actual dimension of work extends to the limiting end of ascendance on a human scale. As such, higher order activities and higher level of activity as such could be one such alignment of the level of consciousness. The situation, thus, could lead to the action of the day and the fundamental elements of the flow of lives on earth, thus flows forward. Goodness as such could lead to a transformative dimension that banks on the fundamentals to the world of

goodness on top of the world of the mix and diversity.

Yat Badami madhumat tat Badami.
Yat dakshmae tad vananti ma
Tishi manasmi yutiman.
Aura anyam hanmi dadhatah. (A.V 12-1-58)

(When I speak in the world, I am drenched in the sweetness. What I look at endears itself to me. I am now engaged in sweet urgings. Any restraint will be put down or crushed.)

Whenever there are the focus of the entity on the new dimensions of the intrinsics that assumes the unit and it works as such a wavy flow of the work in the world that matters to the flow of actions in the world.

The fundamentals transform as a result and thus the changes in the empirical position of the world happens impacts of which spreads to the different dimensions of life.

Not Me. But Thou First : Vastness of the mother is experienced in the earth system. We calf 'the mother earth'. The basic principle around which mother earth functions is that of 'not me but thou'. At times it comes down to the making of sequential principles suited to the healthy flow of life The earth principle is not only principle for the growing in life of herbs, shrubs, trees, plants, animals, humans but to maintain each.

Viswasvam mataram oushadhinam.
Dhrubam bhumin prithivim dharmana dhritam.
Shivam syonam. Aunu charanah viswaha (A.V 12-1-17)

(Mother earth, You have made the entire creation grow. The creations on soil and maintained by you should abide righteous path. The elements of earth are maintained by you graciously. May you be gracious to all on earth as you offer the endowed. The eternal law be the guiding righteous principles of life.)

The vastness of the creation contained in the earth system is something to be considered as being the factor of life on earth. The earth thus grows infinite variety of lives. Each one having its own identity, characteristics and the features in the formation and through the process of the being and becoming of the lives on earth. Right from the smallest creatures through the longer ones, the factors and features of life requires continuous nurturing, caring and supporting. These are the fundamental attributes that are required to hold the earth system grow into its culminating position. The earth system thus stands by each and every category of the living entities into the factors of the flow of lives. These are the effective positions of each life to have dependence, interdependence and mutual acceptance of the factors of lives. As such, the earth system holds its qualities and features for the making of effectiveness and growth in lives. Earth has the infinite power to mother all the creatures and helps in the process of creation, maintenance and caring of each, given the respective contextual situations in the functioning and flow of life.

Vanaspatih sana devesh nah aagon
Rakshah pishachan aupabadnaman
Sah Utah shrayatae pra dadati vacham.
Tena lokan aubhi sarvan jayema. (A.V 12-3-15)

(May the king, tree of the woods have the senses of light in life. May the power and strength and volume in all possible be revealed. The forces as such shall rise in the event of such remain strong. All powers of delusions and ill in all situations be won. Your strength be passed down to me in the context of the world unity.)

The nature has thus the widespread arrangements to take care of an entity, like a big banyan of big tree and then work in the context of a small algae as well. Requirements are different, contexts are different, situations are different, yet the factors of life and the soft touch for the maintenance and growth of lives are feasible in the domain of the mother. Whether the act of mothering is the same, in all these cases remain the same or even differ widely. The mother earth has provided the kingly magnanimity to the kingly dimension and attribute of the entire earth system. In order that the kingly big banyan tree grows into its own condition and eventuality, the earth system would support the kingly tree towards the features of completion are nurtured in perennial terms. It is that perennial activity that features into the harvest of the grown things. Harvest is the final phase of the output. Certain categories of the output get their harvest through the choice, as such the output of the soil through its being into the functional aspect of the harvesting of the categories that are collected as the output by the human society in the backdrop and context of the world and in the perspective of the human choice for requirements to make survival. This also measures the very wide divine involvement for nature.

—o—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল**, কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH **REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027**
1st August 2025 **Regn. No. WBBEN/2006/18733**
Shravan–1432
Vol. 23. No. 4 **Price : Rs. 5/-**

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৩রা আগস্ট, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১০ই আগস্ট, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১৭ই আগস্ট, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২৪শে আগস্ট, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ৩১শে আগস্ট, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.